300

উনপঞ্চাশী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২ নং রামরতন বোস লেন, শ্যামবাজার,

কলিকাতা

১৩২৯

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উৎসর্গ

উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে ও

রাজদ্বারে যিনি আমার সাথী

সেই পণ্ডিতজীকে

এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার।

মুখবন্ধ

যাদের ভালবাসা যায়, সংসারে তাদের নিয়েই ঠাট্টা করা চলে; সুতরাং উনপঞ্চাশীর মধ্যে যদি কেউ নিজের ছবি দেখতে পান, ত সেটা আমার ভালবাসার নিদর্শন বলেই মনে করবেন। উনপঞ্চাশ বায়ু যার উপর ভর করে, তার কথার তাল, লয়, মান সব সময় ঠিক না থাকবারই কথা। সুতরাং হাসাতে গিয়ে যদি কাউকে রাগিয়ে দিয়ে থাকি, ত তিনি মনে রাখবেন—'পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।'

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯,
১২, রামরতন বোস লেন,
শ্যামবাজার, কলিকাতা।

ইতি—
গ্রন্থকার

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা

উনপঞ্চাশী।

(১)

অবতারের মহিমা।

সে দিন পূর্ণিমা। সন্ধ্যাবেলাই চায়ের পেয়ালা কোলে করে পণ্ডিত হৃষীকেশের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বসে রকম বেরকমের খোসগল্প করা যাচ্চে, এমন সময় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাতে হাঁপাতে গোপাল দা' এসে উপস্থিত।

গোপাল দা'কে তোমার মনে আছে ত? দাদার যা' বয়স তা'কে ঠিক যৌবন বলা চলে না, কিন্তু এখনও তেমনি নধর গোলগাল চুকচুকে চেহারা; আর দুপয়সা রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মকর্ম্মেও মতিগতি হয়েছে। বার, ব্রত. উপবাস, হাঁচি, টিকটিকি প্রভৃতি অষ্টসাত্বিক লক্ষণের অনেকগুলিই দেখা দিয়েছে, টাকের পিছনে একটি ছোটখাট টিকিও গজিয়েছে। দাদা ফিরছেন এই পূজার পর সস্ত্রীক গয়া দর্শন করে।

ঘরে ঢুকেই একখানা ঠ্যাং-ভাঙ্গা চেয়ারের উপর বস্‌তে গিয়ে দাদা প্রায় ডিগবাজী খাব খাব হয়েছেন এমন সময় পণ্ডিত হৃষীকেশ চায়ের পেয়ালায় গোঁফজোড়া জুবড়ে চোখদুটি উঁচু করে খুব সহানুভূতিসূচক স্বরে বল্‌লেন—"দেখো, দাদা, ভাঙ্গা চেয়ারখানায় যেন বসো না"। দাদার চোখের কোনে সাত্বিক প্রকৃতির ঈষৎ বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিল; কিন্তু দাদা সেটুকু সামলে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—

"এবার গয়ায় গিয়ে দেখে এলাম বুদ্ধদেবের দাঁত। সহজে কি মোহান্ত দেখাতে চায়! অনেক কাকুতি মিনতি করে তবে দর্শন পেয়েছি।

অবতার পুরুষের অঙ্গ কি না—এই এত বড়! আর কি মহিমা, ভায়া! অমন হাজার হাজার লোক সেখানে পুজো মানস করে আধিব্যাধি থেকে মুক্ত হচ্চে।”

পণ্ডিত হৃষীকেশ ততক্ষণ নিজের পেয়ালাটী নিঃশেষ করে দাদার জন্য এক পেয়ালা ঢেলে ভুল করে নিজের মুখের দিকে তুলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বুদ্ধদেবের দাঁতের মহিমা শুনে সেটি আবার নামিয়ে রেখে বল্লেন—“তা, আর হবে না! আমাদের বিটলেরাম বাবাজী ত’ ভক্তিতত্ব-কুজ্ঝটিকায় লিখেই গেছেন—হরির চেয়ে হরি নামের বেশী মাহাত্ম্য, তা’ বুদ্ধদেবের চেয়ে তাঁর দাঁতের মহিমা যে বেশী হবে, এতো জানা কথা।”

বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে এ রকম বক্রোক্তি শুনে গোপাল দা’ একটু ক্রুদ্ধ হবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরাত্মার যে ক্রোধের উদ্রেক হয়েছিল তা তাঁর অস্থি, মজ্জা, মেদ, বসা, চর্ম্ম, ফুঁড়ে বহিরঙ্গে প্রকাশ হবার পূর্ব্বেই পণ্ডিতজী ফের বক্তৃতা সুরু করে দিলেন—

“শাস্ত্রে যে বলে অবতার পুরুষেরা আত্মভোলা, গোপালদা’র কথা শুনে সে সম্বন্ধে আজ আমার সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল। আহা! দেখ একবার তামাসা! বুদ্ধদেব নিজেই সংসারের আধিব্যাধির দাওয়াই খুঁজতে খুঁজতে হায়রাণ হয়েছিলেন। তাঁর নিজের দাঁতের যে এত গুণ তা’ যদি জানতেন, ত একটা কেন, বত্রিশটাই উপড়ে ফেলে গোপালদা’কে বখসিস দিয়ে যেতেন। বৌদিদিকে আর তা’ হলে ঢোলকের মত এতগুলো মাদুলি বয়ে বেড়াতে হতো না।”

বক্তৃতার ঝাপ্‌টা লেগে চা’টা মাঝ থেকে ঠাণ্ডা হয়ে যায় দেখে আমিই সেটার সদ্ব্যবহার করে নিজেকে একটু গরম করে নিলুম। কেন না দেখলুম যে, এই শনিবারের বারবেলায় পণ্ডিতজীর জিহ্বাখানি বেশ একটু বিষিয়েছে, কাউকে না কাউকে না ছুবলে তিনি ছাড়বেন না।

যুগে গোপালদা'র শ্যামবর্ণ মুখখানি একেবারে অন্ধকার বর্ণ হয়ে দাঁড়াল। তক্তাপোষে একটা বিরাট চাপড় মেরে তিনি বল্লেন—

"কি সর্ব্বনেশে কথা! আমি দেখে এলাম বুদ্ধদেবের দাঁত, আর তুমি না বল্লেই হবে! অবতার পুরুষদের তুমি ঠাওরেছ কি? তাঁদের মহিমা যুগযুগান্তর ধরে থাকে!"

পণ্ডিত হৃষীকেশ বক্তৃতার পর গলাটা একটু ভিজিয়ে নেবার জন্য এতক্ষণ আর এক পেয়ালা চা ঢালছিলেন। এক চুমুক খেয়ে জিহ্বাটা বেশ একটু শানিয়ে নিয়ে বল্লেন—

"সে কথা আর বল্‌তে! মহিমার জ্বালায় হাড় ভাজা ভাজা হয়ে উঠেছে। এলেন ত্রেতাযুগে অবতার রামচন্দ্র, আর ছেড়ে দিয়ে গেলেন দেশের মধ্যে এক পাল হনুমান! গেরস্তর বাগানে কলাটা, মুলোটা বার্ত্তাকুটা কিছুই আর থাকবার জো নেই! তার পর দ্বাপরে এলেন শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র, ঢলাঢলি রক্তারক্তি যা করে গেলেন, তার ছাপ এখনও দেশ থেকে মোছেনি। কলিতে নাকি এসেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ—আর ছেড়ে দিয়ে গেছেন দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে নেড়ানেড়ী। বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে বাড়ীর ভিতরে এসে—'জয় রাধে কৃষ্ট', দাও মা দুটি ভিক্ষে।' দিতেই হবে;—আর এদিকে চালের দর ১২৲ টাকা। আজকাল আবার গাঁয়ে গাঁয়ে অবতার গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মে দেশময় ত্যাগধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করতে লেগে গেছেন। পুরাণো অবতারদের তবু দুটো ফুল বিম্বপত্র দিয়েই তুষ্ট করা যায়; কিন্তু এই হালফ্যাসানের অবতারদের বচনের ঠেলা সামলাতে পোড়া দেশের যে কত দিন লাগবে তা ভগবানই জানেন।'

পণ্ডিত হৃষীকেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাকি চা টুকু শেষ করে নিলেন। গোপাল দা' কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু তাঁর ভাবটা স্ফুট ভাষায় ব্যক্ত হবার পূর্ব্বেই মা সরস্বতী আবার পণ্ডিতজীর জিহ্বায়

ভর করে বোসলেন। তিনি ঊর্দ্ধবাহু হয়ে শূন্যে একটা ঘুঁসকি মেরে বল্লেন—

"চুলোয় যাক্ ত্যাগের কথা। ঘরে সম্পত্তির মধ্যে ত একটা বুড়ী ব্রাহ্মণী আর একটা শিংভাঙা গোরু; তাও আবার দু' বছর থেকে দুধ দেয় না। সেগুলো না হয় কামিনী কাঞ্চনের দোহাই দিয়ে ত্যাগই কল্লুম। আর এই দুর্ভিক্ষের দিনে অবতার পুরুষদের হুকুম মত কোন দিন বা উপবাস, কোন দিন বা পান্তাভাত ভক্ষণ, তাও না হয় চলতে পারে। কিন্তু অবতারেরা যদি পাঁজি পুঁথি দেখে একটা ভাল দিন স্থির করে হুকুম করেন যে আজ পাঁচ্টা দশ মিনিট থেকে সাতটা বাইশ মিনিট পর্যান্ত সবাই মিলে কাঁদ; কাল ন'টা সতের মিনিট থেকে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত সবাই মিলে গড়ের মাঠে গিয়ে ডিগবাজী খাও, তা'হলে যে পৈতৃক প্রাণটা নিতান্তই অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। এ সব দাঁত পূজো, খড়ম পূজো, কাঁথা পূজোরই উল্টা পিঠ।"

কথাগুলোর মধ্যে রাজনীতির একটু বোটকা গন্ধের আভাষ পেয়ে তাড়াতাড়ি সেরে নেবার জন্য আমি বল্লাম—

"ও সব সে কালে চল্‌তো, পণ্ডিতজী; আজকালকার ছেলেরা অত সহজে ঘাড় নোয়ায় না।"

পণ্ডিতজী একটু হেসে বল্লেন—"ঐ ত তোমাদের রোগ, ভায়া; পুরাণো বন্ধু একটু বেশ বদ্‌লে এলে আর তোমরা চিনতে পার না। মানুষের ধাত কি আর অত সহজে বদ্‌লায়? ছাপান্ন পুরুষ ধরে যারা খড়ম পূজো কোরে এসেছে, তা'দের ঘাড়গুলি কা'রো না কা'রো পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। যেমন তেমন একটা হলেই হলো—হয় গুরুঠাকুর, নয় প্রভুপাদ, নয় মহাত্মা, নয় লিডার। ওসব এক জিনিসেরই কালভেদে ভিন্নরূপ। এঁরাই প্রোমোশন পেয়ে ক্রমশঃ অবতার হয়ে দাঁড়ান। তখন তাঁদের হাড়ে ভেল্কি জন্মে, দাঁতে

রোগ সারে; চটিজুতার শুকতলা ভিজিয়ে খেলে একবারে পরমপদ প্রাপ্তি হয়।"

চটিজুতার কথা শুনে গোপাল দাও হেসে ফেল্লেন, কিন্তু পণ্ডিতজীর তখন বক্তৃতাটা মাথায় চড়ে গেছে। তিনি বল্লেন :—

"না, না, দাদা, এটা হেসে উড়াবার কথা নয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, এমন কি গার্হস্থ্যনীতিতে পর্যন্ত আমরা ঐ খড়মপুজোকেই সার সত্য বলে স্থির করে ফেলেছি। আমরা ফুল বিল্বপত্র হাতে করে বসে আছি, যেই একটি ছোট খাট মহাপুরুষের আবির্ভাব, অমনি শ্রীচরণে অঞ্জলি দিয়ে, ঢাক ঢোল কাঁশি বাজিয়ে, চামর ঢুলিয়ে, হেসে কেঁদে, নেচে গেয়ে এমনি একটা বীভৎস ব্যাপার করে তুলি যে মহাপুরুষটি যদি সাক্ষাৎ ভগবানও হন, ত তাঁর ভূত হয়ে যেতে বড় বেশী বিলম্ব হয় না। তারপর তাঁর দাঁত, নখ, চুল নিয়ে দলাদলি আর মারামারি। তিনি ফুস্ করলেন কি ফাস্ করলেন, টুক্ করলেন কি টাক্ করলেন—এই নিয়ে গভীর আধ্যাত্মিক গবেষণা! এ সব কি ধর্ম্ম রে বাপ!—এ শুধু জড়ভরতদের জটলা; বক-ধার্ম্মিক শেয়াল-কোম্পানীর আধ্যাত্মিক হুকা-হুয়া।"

গোপাল দা এতক্ষণ চুপ করে ভ্যাদা গঙ্গারামের মত বসে ছিলেন। এইবার পণ্ডিতজীকে থামতে দেখে একটু সাহস পেয়ে বল্লেন—"তা' বলে ত আর বাপ পিতাম'র ক্রিয়াকাণ্ড ছাড়তে পারি নে।"

পণ্ডিতজী লাফিয়ে উঠে বল্লেন—"সে দোষত তোমার নয়, দাদা, দোষ তোমার ভগবানের। মনটা যার এখনও চার পায়ে হাঁটে, তাকে মানুষের আকার দিয়ে তার শরীরটাকে দু'পায়ে হাঁটান—একটা অত্যাচার বৈত নয়! মনটা আমাদের ক্রমাগত খুঁজছে কোথায় কার পায়ের তলায় পড়ে নাক রগড়াবে; তাই আমরা সব কাজেই একজন না একজন মুরব্বীর দোহাই দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। পরকালের ব্যবস্থা করতে হবে—ত

টেনে আন দু'চারটি মহাত্মাকে না হয় অবতারকে; দেশের স্বাধীনতা চাই ত আওড়াও মিল বেনথামের বুলি; সমাজ গড়তে হবে ত নিয়ে এস ধার করে বল্‌সেভিজম্; ঘরকন্না গড়তে হবে, ত ডাকো রাজা ঠানদিদিকে, না হয় ত পলী পিসিকে। মোট কথা কারো না কারো আওতায় পড়লে তবে আমরা থাকি ভাল। আমাদের মনগুলি যে এক একটী বোরখাঢাকা পর্দানসিন বিবি। ভগবানের খোলা হাওয়া গায়ে লাগলেই তাঁদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পণ্ড হয়ে যাবে। আমাদের মনে মনে বেশ একটা ভয় আছে যে পাঁচজন মুরব্বী মিলে ভগবানের এই সৃষ্টিটাকে ঠেকনা দিয়ে না রাখলে সৃষ্টিটা একদিন হুড়মুড় করে পড়ে যাবে। তাই আমাদের কথায় কথায় পরের দোহাই, বাপ পিতাম'র নাম করে নিজেদের পঙ্গুত্ব লুকিয়ে রাখা। নমশূদ্রদের জল চল করতে হবে, ত দেখ পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য কি বলে গেছেন; আর পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য যে এদিকে কবে মরে ভূত হয়ে গেছেন তার ঠিক ঠিকানা নেই! যাঁরা জাত মানেন, তাঁরা দোহাই দেন পুঁথির, আর যারা মানেন না তাঁরা দোহাই দেন ফ্রেঞ্চ রিভলিউসনের। দোহাই একটা দেওয়া চাই!! নিজের বলে ত আমাদের কিছু নেই। সমাজ আর ধর্ম্ম—বাপ ঠাকুরদাদার; দেশটা বিদেশীর; আর মনটা—যিনি দয়া করে ছুটী পায়ের ধূলা দেন তাঁর। আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে খড়ম-পূজা আর কর্ম্মের মধ্যে পাদোদক পান! সংস্কৃত-পড়া পণ্ডিত, আর ইংরাজী-পড়া গ্রাজুয়েট—সবাইকার ঐ এক গতি; তফাতের মধ্যে এই যে একজন গড়াগড়ি দেন পূর্ব্বমুখ হয়ে, আর একজন পশ্চিম মুখ হয়ে; একজন মন্ত্র আওড়ান সংস্কৃতে, আর একজন আওড়ান ইংরাজীতে। ধর্ম্মের বেলায় সত্যপীর আর রাজনীতির বেলায় মণ্টেগু।"

বক্তৃতাটা বেশ জমে আসছে, এমন সময় বাড়ীর ভিতর থেকে পোঁ করে শাঁখ বেজে উঠতেই পণ্ডিতজী থেমে গিয়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন। ও! আজ যে পূর্ণিমা! আমরা বাগিয়ে বসে বক্তৃতা করছি

আর ব্রাহ্মণী যে ঘরের মধ্যে সত্যপীরকে সিন্নি খাওয়াচ্ছেন! তার পরেই দরজার শিকলি নেড়ে ডাক পড়ল—ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্, ঠুন্ ঠুন্ ঠান। আমি একটু উস্‌খুস করছি দেখে পণ্ডিতজী বল্লেন, "যাও, ভায়া, সত্যপীরের কথা শোন গে। আজ তা' হলে-এইখানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম।"

পণ্ডিতজী বেরিয়ে পড়লেন; আর আমি গোপাল দাদাকে সঙ্গে নিয়ে সত্যপীরের কথা শুনতে চল্লুম। পুরুত ঠাকুর তখন গলা ছেড়ে পড়ছেন—

"একথা শ্রবণ কালে   যেবা অন্য কথা বলে
আর যেবা করে উপহাস,
লাঞ্ছিত সে সর্ব্ব ঠাঁই   তাহার নিষ্কৃতি নাই
অকস্মাৎ হয় সর্ব্বনাশ!

পণ্ডিত হৃষীকেশের যে হঠাৎ কি সর্ব্বনাশটাই ঘটবে তাই ভেবে আমি শিউরে শিউরে উঠতে লাগলাম।

---

(২)

কলের ওস্তাদী।

আমাদের পাড়ায় যদু পোদ্দারের ভাইপো মার্কিন মুল্লুক থেকে কল-কারখানা গড়বার ওস্তাদ হয়ে ফিরে এসেছে—এই কথা শোনা অবধি আমাদের শিরোমণি মশায়ের নাতিটির মুখে আর হাসি ধরে না! ছেলেটা আমার ভারি ন্যাওটো; সুবিধা পেলেই তালটা, বেলটা, কলাটা, নৈবিদ্যির মাথায় সন্দেশটা বাড়ীতে না বলে আমায় এনে দেয়। কলায় ঘুসতে,

ছানা বাঁধতে, দধিকে আদায় করতে তাকে এক রকম অদ্বিতীয় পুরুষ বললেই হয়। পূজোর সময় মাণিকগঞ্জের বাজারে এবার কলায়ের ধুমটা ভারি কমে গিছলো, বলে সে এতদিন মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়াচ্ছিলো। যদু পোদ্দারের ভাইপো একটা দুধের না: কিসের মস্ত বড় কারখানা বানাবে শুনে সে হাসতে হাসতে গড়াতে গড়াতে ফূর্ত্তির চোটে আকাশ পানে ঠ্যাং ছুড়তে আরম্ভ করে দিলে। আমি ত ছেলেটার রকম সকম দেখে বললাম—"কি রে ক্যাব্‌লা, ক্ষেপলি নাকি ?" ক্যাবলা আরও খানিকটা ঠ্যাং ছুড়ে শেষে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে—"না গো দাদামশায়, ভারি মজা হয়েছে; সন্দেশ এবার সস্তা হবেই হবে। গয়লা বেটারা এবার যা জব্দ হবে! যদু পোদ্দারের ভাইপো এমনি একটা কল বানিয়েছে যে তা' বসাবার জন্যে তিন কোশ জমি চাই। কলের এক মুখে থাকবে পঞ্চাশ হাত লম্বা চওড়া বাঘ-মুখো একটা প্রকাণ্ড দরজা, আর একদিকে থাকবে গোটা ২০।২৫ মোটা নল; আর ভিতরে রকম বেরকমের এঞ্জিন। একদিক দিয়ে তাড়া করে তুমি এক পাল গরু সেই কলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও; খানিক পরে দেখবে ও মুখের নলগুলো দিয়ে বেরুচ্চে—দুধ, দই, ছানা, ঘি, মাখন, কাঁচাগোল্লা, চটিজুতো আর সিঙ্গের চিরুণী। কল কি সাঙ্ঘাতিক চিজ, দাদামশায়। ওতে হয় না এমন জিনিস নেই।"

পণ্ডিত হৃষীকেশ এতক্ষণ ঘরের এক কোণে বসে থেলো হুঁকোটায় ভুড়ুক ভুড়ুক টান দিচ্ছিলেন। এইবার খুব একটা দম্‌কা টান টেনে নাক দিয়ে খানিকটা ধোঁয়া বা'র করে দিয়ে বললেন—"এ আর তুই বেশী কি বললি, ক্যাব্‌লা? আমাদের চোখের সামনেই ত এর চেয়ে আরও চমৎকার সব কল বসান রয়েছে। তোরা চোখ থাকতে দেখবিনে, তার আমি কি করব বল্‌?"

ক্যাব্‌লা ত পণ্ডিতজীর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

পণ্ডিতজী বললেন—"অত বড় হাঁ করিস নে, বাপ। কথাটায় দম্ আটকানর মত বিশেষ কিছু নেই। আমি ত চারদিকে ঐ রকম কল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। আচ্ছা, এই ধর—রঘুনন্দন কোম্পানীর পেটেণ্ট ব্রহ্মচারিণী তৈরির কল। একটা বিধবা বা সধবা মেয়েকে ধরে তার নাক চুল কেটে, গয়নাগুলো কেড়ে নিয়ে ঐ কলের মধ্যে ফেলে দাও—দিন কতক পরে ঐ কল থেকে হয় একটা ত্রিশূল-ধারিণী ভৈরবী, নয় একটা যক্ষাকেশো ব্রহ্মচারিণী বেরিয়ে আসবেই আসবে। তার পর ধর কল নং. ২—পতিব্রতা তৈরির কল। খুব ছেলেবেলায় একটা কচি কাপড়ে-হেগো মেয়েকে ঘোমটা দিয়ে সাতপুরু মুড়ে ঐ কলের মধ্যে ফেলে দাও, মাঝে মাঝে কেবল এক এক খানা গয়না ছুঁড়ে ঐ কলের মধ্যে ফেলে দিও— দেখবে বছর কতক পরে একটী খাসা নথ-নাকে, মিশি দাঁতে, ঝাঁটা হাতে সীতা বা সাবিত্রী তোমার ঘর উজ্জ্বল করে দাঁড়িয়ে আছে।

"এ সব না হয় সেকেলে মিস্ত্রীর গড়ন—তা বলে আজ কালের মিস্ত্রীরাও ফেলা যান না। ঐ আমাদের গোঁফেশ্বর মিস্ত্রী এমনি কল বানিয়েছে যে তার মধ্যে খানকত সরকারী ছাপমারা বই ভরে দিয়ে একটা গাধা হোক, ঘোড়া হোক, ভেড়া হোক, যা হোক একটা তার মধ্যে পুরে দাও, বছর কতক না যেতে যেতেই কলের ও-মুখ থেকে একটা M. Sc., B. Sc. বেরিয়ে আসবেই আসবে। এ কি কম ওস্তাদি, বাবা!

"তারপর আমাদের টেক্‌ষ্টবুক কমিটি রায় বাহাদুর তৈরি করবার কি কলই না বানিয়েছে! একটা ছোট ছেলেকে ধরে দীনেশ বাবুর রাজারাণীর ছবিওয়ালা বইগুলোর খানকয়েক পাতা দিয়ে তাকে মুড়ে ঐ কলের মধ্যে ফেলে দাও—একেবারে মাথায় সামলা আঁটা একটা রায় বাহাদুর, না হয় রায় সাহেব সেখান থেকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে আসবে!

সাবাস জোয়ান! এমন না হলে কর্ত্তার!

পণ্ডিতজী আবার থেলো হুঁকোটা তুলে নিলেন। ক্যাব্‌লা কিন্তু হাঁ করে তাঁর মুখের পানে চেয়েই রইল।

---

(৩)

ভবপারের নৌকা।

গোপাল দাদার গুরুঠাকুর এসেছেন শুনে পণ্ডিত হৃষীকেশের হঠাৎ কি রকম ভক্তির উদ্রেক হলো; তিনি তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়েই এই শীতকালের সন্ধ্যাবেলা গুরুজীকে দর্শন করতে বেরিয়ে পড়লেন। আমি ভাবলুম—হবেও বা, পণ্ডিতজীর বয়স ত প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হয়ে এলো; সূর্য্য ত বিলক্ষণই পশ্চিমে হেলে পড়েছে; এইবার বুঝি পণ্ডিতজীর একটু পরকালের চিন্তা এসেছে। বিশেষতঃ গোপাল দাদার গুরু এক প্রকাণ্ড সিদ্ধপুরুষ বলে প্রসিদ্ধ, তাঁর চেলাও দশ বিশ হাজারের কম হবে না।

প্রায় এক ঘণ্টা চুপ করে বসে আছি, দেখি না পণ্ডিতজী—আস্তে আস্তে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে তক্তাপোষের উপর বসে পড়লেন। মুখখানা খুব গম্ভীর বটে, কিন্তু চোখের কোণে একটু চাপা চাপা দুষ্টু হাসি।

"কি পণ্ডিতজী, এরি মধ্যে সাধু-দর্শন শেষ হয়ে গেল যে!"—বলে আমি হুঁকোটা পণ্ডিতজীর হাতের কাছে এগিয়ে দিলাম।

পণ্ডিতজী হুঁকোটা রেখে দিয়ে বল্লেন—"না, ভায়া, এ আর চলবে

নীন একে ত সাধুজী ভাব-জগতের যে আধ্যাত্মিক ধোঁয়া ছেড়ে দিয়েছেন তা'তেই আমার দম্ আটকাবার জোগাড় হয়েছে; তার উপর ঐ মায়িক, নশ্বর, পার্থিব ধোঁয়াটা এসে জুটলে আমার প্রাণে বাঁচা দায় হবে।"

আমার একটু রাগ হলো। সবাই বলে গোপাল দাদার গুরু মস্ত বড় সাধু; আর পণ্ডিতজী তাঁর উপরও টিপ্পনী কাটতে ছাড়লেন না! আমি বল্লুম—

"দেখ, পণ্ডিতজী, তুমি একটি বিশ্বনিন্দুক। অত বড় একজন সাধু, যাঁর চরণ পেয়ে কত লোক তরে যাচ্চে, তাঁকে দেখে তোমার মন উঠ্‌ল না।"

পণ্ডিতজী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্লেন—"কি করব, ভায়া,—আমার কেমন পাষণ্ড-নক্ষত্রে জন্ম, খুঁৎটাই আগে চোখে পড়ে। আমি দেখতে গেলুম একটা পুরো মানুষ আর দেখে এলুম পাঁচ সাত হাত লম্বা জটাওয়ালা এক ভুঁড়েল সাধু বাঘছালের উপর বসে বসে সকলকার ভব-রোগ সারাবার পেটেন্ট দাওয়াই বাৎলাচ্ছেন। অনেক বোঝবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু এই 'ভব'টা যে একটা রোগ এটা কিছুতেই বুঝতে পারলুম না।

আর একটা বড় মজার কথা মনে পড়ে গেল। সেকালে দময়ন্তী যখন স্বয়ম্বরা হন, তখন রাজ-সভায় দেবতারা লোভে লোভে উপস্থিত হয়েছিলেন। কা'রও চোদ্দটা মাথা আঠারটা ঠ্যাং, কারও বা পনেরটা নাক, ত্রিশটা পাছা—সবাই এক একটা কেষ্ট বিষ্টু ধনুর্দ্ধর। কিন্তু দময়ন্তী সটান গিয়ে নলরাজার গলাতেই মালা দিয়ে বলেছিলেন—'আমি নারী, সুতরাং আমি নরই চাই। দেবতা নিয়ে আমার কি হবে?'

আমার সেই কথাই মনে হতে লাগ্‌ল—ভবপারে গিয়ে আমি করব কি? আমার এপারের যা-কিছু নিয়েই যে কারবার। এপারের তোমরা কেউ একটা ব্যবস্থা করতে পার?

সেই সেকালের বুদ্ধ শঙ্করের আমল থেকে আজকালকার ছোটখাট গুরুর গুরু পরম গুরু পর্য্যন্ত সবাই, নৌকা নিয়ে কূলে দাঁড়িয়ে হাঁকচেন—'চলে আয় ভবপারের যাত্রী, সস্তা দরে পার করে দেব।' কেউ বলছেন,—'আমার এ নৌকায় গেরুয়া নিশান, একেবারে পরম ধামের মুক্তি-ঘাটায় গিয়ে লাগবে; নৌকায় একবার চড়ে বসো, হালুয়া পুরির অভাব হবে না।' কেউ বা বলচেন—'আমার এ নৌকায় নতুন গাব মাখান হয়েছে। জল ঢোকবার কোনই ভয় নেই। ঝড় তুফান লেগে যদি নৌকা এক-পেশে হয়, ত আমাদের নাচন কোঁদনের ভরেই নৌকা সামলে উঠবে। ঐ বৈকুণ্ঠের উপরে গোলোক, তার উপরে শব্দ ব্রহ্মের ঢোলোক যেখানে বাজছে, আমরা 'বদর' 'বদর' বল্‌তে বল্‌তে একেবারে তোমাদের সেইখানে পৌছে দেব।'—বাপ! জগৎটা যে দুঃখময় তা পারে-যাবার যাত্রীদের এই জগৎ থেকে স'রে পড়বার জন্য ঠেলাঠেলি দেখলেই বেশ বুঝতে পারা যায়।'

পণ্ডিতজীর মুখখানা যখন খুলে যায়, তখন আর লঘুগুরু জ্ঞান থাকে না। এক নিঃশ্বাসে সব মহাপুরুষদের মুণ্ডপাত করতে দেখে আমি বল্লুম—"তোমার দুঃসাহস ত কম নয়। তুমিই শুধু ঠিক বুঝেছ, আর সবারই ভুল?"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—'চোটে যেয়ো না দাদা; বড় বড় নামের বোঝা আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে আমায় চেপে মেরে কোন লাভ নেই। নিউটন মাথা ঘামিয়ে বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বই বার করে গিছলেন; কিন্তু আজ-কালের কলেজের ছেলেরাও তাঁর চেয়ে বেশী জিনিস জানে। তা দিয়ে কি প্রমাণ হয় যে, ঐ সব ছেলেরা নিউটনের চেয়ে বুদ্ধিমান? শুধু এইটুকুই বোঝা যায় যে, মানুষের জ্ঞানের মাত্রা বেড়ে চলেছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাই। আগেকার মহাপুরুষেরা যে অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন সেইটেই চরম সত্য, বা একমাত্র সত্য, এ কথা না মানলে

আর তাদের পন্থা ভিন্ন অন্য পন্থা খুঁজলে যদি তাদের অপমান করা হয়, ত আমি নাচার। তাঁরা ভবপারে যাবার রাস্তা বাৎলে গেছেন—বেশ কথা। গোলোকের উপর ঢোলোকই থাক আর নোলোকই থাক, সে সংবাদে আমার দুঃখ ঘুচবে না। সেই যে সেদিন গুপে বাগদির ছেলেটাকে জমীদারদের কাছারীতে টেনে নিয়ে গিয়ে বেদম মারলে, তার চীৎকারেই আমার কাণ ভরে আছে। সেখানে শব্দব্রহ্মের ঢোলকের আওয়াজ একেবারেই ঢুকছে না। আমি এ পারের মাটি কামড়েই পড়ে থাকব, এই খানেই শুধু বাঁচব। আমার দুঃখে যদি কোন দেবতার প্রাণ কাঁদে ত তাঁকে তাঁর গোলোক ছেড়ে আমার কাছে আসতে হবে। ও পারে গিয়ে কি রকম দু'শ মজা লুটবো তার লম্বা চওড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাকে ভোলালে চলবে না! স্বর্গের দেবতা যদি স্বর্গেই থেকে যান, মর্ত্তে যদি তাঁর পা না পড়ে ত সে দেবতার কাছে মাথা খুঁড়ে আমার কোন লাভ নেই। সবাই যদি এখানে থেকে মরে, ত আমি একলা পালিয়ে গিয়ে বেঁচে কি করব ?"

মহাপুরুষদের নিয়ে এই রকম খোঁচাখুঁচি দেখে আমার প্রাণটা আঁৎকে উঠছিল। আমি বল্লাম "পণ্ডিতজী, এই সব অবতারকল্প মহাপুরুষ বা ভগবানের বিষয় নিয়ে এ রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ কি ভাল ?"

পণ্ডিতজী হোঃ হোঃ করে হেসে বল্লেন—'ওঃ তাই বটে! ঐটে হজম করতে বেগ পেতে হোচ্চে। তা, দেখ, ভগবানের একটা নাম রঙ্গনাথ। তিনি যে Sunday schoolএর হেডমাষ্টারের মত খুব একজন গম্ভীর পুরুষ, এ কথা আমার আদৌ মনে হয় না। যারা ভগবানকে নিয়ে পুঁটলি বেঁধে ভবপারের পেটেণ্ট পিল তৈরি করেন, তাদের ব্যবসার হানি হতে পারে বটে—কিন্তু ভগবান যদি নিতান্ত বেরসিক না হন, তা হলে ঐ জন্যে আমার উপর চটে যাবেন বলে ত মনে হয় না। আর মহাপুরুষদের কথা যদি তুললে ত বলি—'সত্যের

ভাঁড়ার যদি তাঁরা উজাড় করে দিয়ে থাকেন, আর আমাদের পক্ষে তাঁদের এঁটোকাঁটা দু-একখানা খুঁটে খাওয়া ভিন্ন যদি উপায়ান্তর না থাকে, তা' হলে এই দুনিয়ার কলে চাবি বন্ধ করে দিয়ে, ভগবানের এই সৃষ্টির ব্যবসা তুলে দেওয়াই উচিত।'

আমি বললাম—"একবার ভবনদীর ওপারে গিয়ে সেই জন্যে একখানা দরখাস্ত না হয় ভগবানের দরবারে পেশ করে আসি।"

পণ্ডিতজী ঘাড় নেড়ে বললেন—"ওরে গাধা, ওরে আদার ব্যাপারী—দরখাস্ত পেশ করবার জন্যে এবার আর তোকে ডিঙ্গিচড়ে ও-পারে যেতে হবে না। এবার ভরা-ভাদরের বান ডেকে এপার ওপার সব একাকার করে দিয়ে যাবে। গুরুগিরির ব্যবসাটা এবার আর টিকবে না।'

(৪)

ছিরিচরণের ছুঁচো।

সে দিন সকাল বেলা চা খাবার পর পণ্ডিতজীর একটু খোসমেজাজ দেখে গোপাল দা একবার এগিয়ে দুবার পেছিয়ে, শেষে একটু গলা খেঁকারি দিয়ে, দুঃসাহসে ভর করে জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, পণ্ডিতজী, যদি রাগ না করেন, ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনি গুরু ঠাকুরদের পেছনে অত লেগেছেন কেন?"

আমি আরও এক কাপ চা ঢালছি দেখে পণ্ডিতজীর তাল-তোবড়া মুখখানিতে একটু হাসির আভাষ ফুটে উঠল। তিনি বললেন—"রাগ কেন করব ভাই; রাগ আমার শরীরে নেই বললেই হয়। যা দেখতে পাও, ওটা রাগের আকার, ওতে মানসিক বিকারের গন্ধমাত্র নেই। দুর্বাসা ঋষি মরবার সময় আমার প্র-পরা-অপ-সম-নি-পিতামহকে যে

আশীর্ব্বাদ করে গিছলেন, তারই যা কিছু ছিটে ফোঁটা পড়ে আছে। ওতে ভয় পাবার কিছু নেই।"

চায়ের কাপটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে খুব আদরে-ভরা একটা চুমুক দিয়ে পণ্ডিতজী বলতে লাগলেন—"দেখ, ঐ শুকগিন্নির কথা যদি জিজ্ঞাসা করলে, ত ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলি।

জানত, ডাক্তারেরা একটা জন্তু জানোয়ারের এক আধখানা হাড়ের টুকরো পেলেই তা দেখে বলে দিতে পারেন, যে জন্তুটা ক' হাত লম্বা, ক' হাত চেওড়া, তার ক'টা ঠ্যাং, সে খায় কি—ইত্যাদি। আমিও তেমনি অনেককেলে ওস্তাদ কি না; তাই কোন একটা সমাজের এক আধ টুকরো অনুষ্ঠান দেখলেই তাদের চাষা ভূষো থেকে আরম্ভ করে রাজা-রাজড়ার পর্য্যন্ত হাঁড়ির খপর বলে দিতে পারি। ঐ যে সে দিন দেখলুম গঙ্গার ধারে নেড়া বট গাছের তলায় জটাজুটওয়ালা বাবাজীটী ছাই মেখে বসে বসে গাঁজায় দম মারছেন আর গুপে বাগদির ছেলে থেকে আরম্ভ করে পেন্সেন-প্রাপ্ত সব ডেবটী পর্য্যন্ত মাদুলী ভরে ভরে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে নিয়ে যাচ্চে—এই থেকে যদি বল, ত আমি এদেশের সমাজতত্ত্ব, ভগবৎতত্ত্ব, রাজতত্ত্ব সব নিখুঁত করে তোমার সামনে কষে দিতে পারি।"

পণ্ডিতজীর কথা শুনতে শুনতে গোপাল দাদার হাঁ টা ক্রমে আকর্ণ বিস্তৃত হবার জোগাড় হচ্ছে দেখে পণ্ডিতজী চায়ের কাপটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন—"গলাটা একটু ভিজিয়ে নাও ভায়া; কাণে শুনে কথাগুলো বোঝবার সুবিধে না হয়, ত মুখে দিয়ে শোনা ছাড়া আর উপায় কি? তা, মুখ দিয়েই শোন; আর একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বুঝো, তা'হলে নিতান্ত গুরুপাক না'ও হতে পারে।

গোপাল দা নির্ব্বিবাদে চাটুকু গিলে ফেলে পণ্ডিতজীর মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—"তার পর?"

—"তার পর আর কি! শুপে বাগদীর ছেলেটাকে হাসতে হাসতে ফিরে যেতে দেখে আমার মনে হলো—নিজের বিদ্যেটা ঠিক কি না একবার পরীক্ষা করে দেখি। ছেলেটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—হাঁরে, খাঁদা, আজ এখনি যদি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-ভগবান একেবারে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে ধড়া চুড়ো পরে ঐ আকাশ ফুঁড়ে তোর সামনে ঝুপ করে নেমে এসে তোকে বলে—খাঁদা, বর নে—তা হলে তুই কি চাস?"

খাঁদা রাঙ্গা রাঙ্গা দাঁত বার করে এক গাল হেসে ফেলে বল্লে—"এঁজ্ঞে বাবাঠাকুর. আমরা শূদ্দূর ক্ষুদ্দূর মানুষ, আমাদের কি সে ভাগ্যি হবার জো আছে?"

—'ধর যদি বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েই যায়?'—

খাঁদা আমতা আমতা করতে করতে মাথা চুলকুতে চুলকুতে বললে—'এজ্ঞে, আমি তা'হলে বলি, দেবতা, আমি যেন মরে বৈকুণ্ঠে গিয়ে আপনার ছিরিচরণের আশে পাশে ছুঁচো হয়ে কিচকিচ করে বেড়াই।'—

সেদিন জমীদারের নূতন নায়েবটা যখন শুপে বাগদীর ছেলেকে ধরে বাকি খাজনা আদায়ের জন্যে মারতে মারতে একেবারে লম্বা করে ছেড়ে দিলে, আর ছোঁড়াটা শুধু নায়েবের হাতে পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করতে লাগলো, তখন আমার চোখে ব্যাপারটা বড় বিসদৃশ, এক-তরফা রকমের বলে মনে হয়েছিল।

আর তার পরদিন তার গায়ের ব্যাথা মরতে না মরতে যখন দেখলুম যে সে ঐ বট-তলার গঞ্জিকানন্দ বাবাজীর পায়ের তলায় চৌদ্দপোয়া হয়ে পড়ে মাদুলী ভরে পদধূলি সংগ্রহ করছে, তখন বেশ দিব্য চক্ষে দেখতে পেলুম যে তার মনটা অনেক দিন থেকে লম্বা হয়ে পড়ে আছে বলেই সে দিন নায়েবের পায়ের কাছে তার শরীরটা অত শিগ্‌গির লম্বা

হয়ে পড়েছিলো। তোমরা ভাবছ তিন বৎসর অন্তর লাটসভার সভ্য গড়বার জন্যে ভোট দিতে গেলেই তারা স্বাধীন হয়ে উঠবে। হায় রে পোড়া কপাল! মাথায় যার সাপে কামড়েছে তার পায়ের আঙুলে বিষ-পাথর লাগালে কি হবে।

পণ্ডিতজীর বক্তৃতা শুনে আমারও একটু ভাবনা হয়ে গেল। গোপাল দা'ও একটু উস্‌খুস্ করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন—"তাইত! তা'হলে উপায়?"

পণ্ডিতজী বল্লেন—"উপায় আর কি! ভগবানের খোলা হাওয়া লোকগুলোর মনে একটু লাগতে দাও; তাতে আধ্যাত্মিক সর্দ্দি, কাশি হবার কোনোই ভয় নেই। আর তোমার পেশাদার গুরুঠাকুরদের বলো একটু আওতা ছেড়ে দাঁড়াতে।"

---

(৫)

স্বদেশী সেপাই।

সেদিন রাজনীতির বক্তৃতা শুনতে শুনতে গোটা দুই বেফাঁস কথা পণ্ডিত হৃষীকেশের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল বলে আমাদের রায় বাহাদুর পার্ব্বতী দাদার বড় ছেলেটা আজ তাঁকে এসে পাকড়াও করেছে। আন্দোলনের জোরে ভারত স্বাধীন হবে শুনে কেন তিনি হেসেছিলেন, এ কৈফিয়ৎ আজ তাঁকে দিতেই হবে!

এবার কংগ্রেসের পর কলকাতা থেকে কলেজ বয়কট করে ফিরে আসা অবধি ছেলেটা ভীষণ রকমের স্বদেশী হয়ে উঠেছে। তার বুটের ফিতে থেকে আরম্ভ করে গলার নেক-টাই, আর মাথার হ্যাটটা পর্য্যন্ত

একেবারে ষোল আনা স্বদেশী কোম্পানীর তৈরি! গ্রামে এসে সে একটা "জাতীয়" ইস্কুল খুলবে বলে চাঁদার খাতাও খুলেছিল; তবে চিফ সেক্রেটারির কাছ থেকে তার বাপের নামে একখানা লম্বা চওড়া চিঠি আসবার পর সেটা ধামা-চাপা পড়ে গেছে।

একে ত রায়-বাহাদুর একজন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার; তাঁর জমীদারীর শুধু বাজে আদায়ই হবে ৫।৭ হাজার; আর সেই সেদিন পুজার নজর দিতে দেরী হয়েছিল বলে তাঁর কাছারীতে গুপে বাগদীর ছেলেটা মার খেয়ে এখনও নেংচে বেড়াচ্চে; আর তারপর—গোদের উপর বিষফোড়া—তাঁর দৌহিত্রীর সঙ্গে আমাদের পুলিস সুপারিনটেনডেণ্টের ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে—আর এ দিকে তাঁর ছেলেটী পুরোদস্তুর স্বদেশী সেপাই; পাড়ার ছেলেগুলো ইস্কুলে গেলেই তাদের ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে বলে সে শাসিয়ে বেড়াচ্চে। বাপ বেটার এই দুই জাঁতা কলের মধ্যে পড়ে চাষাভুষোরা একেবারে পিষে যাবার জোগাড় হয়েছে।

পণ্ডিতজী ছেলেটার মুখখানির দিকে একটু চেয়ে থেকে বল্লেন—"দেখ, বাবা, অনেক দিন আগে—সেকালের স্বদেশী যুগেরও আগে—একবার পাড়াগাঁ অঞ্চলে ভারত-উদ্ধার প্রচার করতে গিয়েছিলাম। একটু চালাক চটপটে রকমের এক চাষাকে ধরে প্রায় দেড় ঘণ্টা আন্দাজ বক্তৃতা ঝেড়ে যখন মনে হল, তাকে কাৎ করে এনেছি, তখন সে অতি বিনীত ভাবে জোড়হাত করে আমায় বল্লে—'আমার একটী নিবেদন আছে।'

আমি এই গরুড়ের মত ভক্তটী পেয়ে বিষম উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লুম—'কি, কি?'

"সে বল্লে—'দেখুন, আপনাদের হাতে দেশ স্বাধীন হবার ২।৪ ঘণ্টা আগে আমায় একটু খবর দেবেন; আমি সপরিবারে বিষ খেয়ে মরে থাকব।'

তখন লোকটার কথা শুনে আমার পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন তোমাদের দেখে শুনে মনে হয় যে, লোকটার কথা একেবারে বাজে নাও হতে পারে।

আমাদের স্বদেশী সেপাইটি বললেন—"আমি থাকলে তাকে চাবকে সোজা করে দিতুম।"

পণ্ডিতজী বললেন—"বাবা, চাবকানি অনেক দেখেছি; কিন্তু চাবুকের চোটে লোককে বেঁকে পড়তেই দেখেচি; একটাকেও সোজা হতে দেখি নি। তোমার দাদা-মশায় চাবুকের চোটে জমিদারীর আয় বিলক্ষণ বাড়িয়ে গেলেন, তোমার বাবাও শাস্ত্র-চর্চ্চার অবসরে যথেষ্ট চাবুক-চর্চ্চা করেন—আর ভবিষ্যতে সুবিধা পেলে তুমিও তা করবে—কিন্তু সোজা কটাকে করেছ?"

ঐ বেতালা কথা কওয়া পণ্ডিতজীর কেমন রোগ! পাছে কথাটা রায় বাহাদুরের কাণে ওঠে সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি বললুম—"তা, ছেলেরা যা করছে, সে ত ভালর জন্যই করছে। দেশটা স্বাধীন হলে গৌরবের ভাগীদার ত চাষাভুষোরাও হবে।"

পণ্ডিতজী আমার দিকে একটা এমনি বিতিকিচ্ছি রকমের চাওনি চাইলেন, যা তাঁর চোখেও বড় একটা দেখিনি। তিনি একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—"দেখ, তোমাদের ঐ ন্যাকামি শুনতে শুনতে আমার হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। তোমরা কথায় কথায় বল— 'আহা, দেশটা যদি আমাদের কথায় সাড়া দিত, ত এত দিন আমরা কেষ্ট বিষ্টু হয়ে যেতুম।' ছাপান্ন পুরুষ ধরে যাদের গলায় এক পা আর পেটে এক পা দিয়ে চেপে রেখেছ—আজ টিকি ধরে হেঁচকা টান মারছ বলেই কি তোমাদের ফরমাইস মত তারা নেচে উঠবে? ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আচারে ব্যবহারে যাদের পরাধীন করে রেখেছ, যাদের ছুঁলে তোমাদের

খাইতে হয়, যাদের বেগার খাটিয়ে তোমরা নবাবী কর, আজ তাদের স্বাধীনতার কথা বোঝাতে গিয়ে নিতান্তই বেহায়া না হলে তোমরা লজ্জায় মরে যেতে! মানুষের মনের আধখানা পরাধীন রেখে বাকি আধখানাকে স্বাধীন করে দেবে?—বলিহারী তোমাদের বুদ্ধি হে! তোমার রাজনীতির চর্চ্চা করবে কে?—যারা করবে, তাদের যে মেরে রেখেছ! এ জাত যদি কখনো বেঁচে উঠে লড়ে, ত আগে লড়বে তোমাদের সঙ্গে।"

আমি দেখলাম, কোঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে ক্রমে সাপ বেরিয়ে পড়বার জোগাড় হচ্চে। তাড়াতাড়ি পণ্ডিতজীর মুখ বন্ধ করবার জন্তে এক কাপ চা তৈরি করে বললাম—"থাক, সে কথা; এ দিকে চা-টা যে জুড়িয়ে গেলো।"

পণ্ডিতজীর কাছ থেকে তাড়া খেয়ে আমাদের রায় বাহাদুরের ছেলে ওরফে স্বদেশী সেপাই মুখখানা বেজায় গম্ভীর করে বললে—"আপনি বলেন কি, আমরা দেশটাকে এত করে বলছি আমাদের সঙ্গে উঠ্‌তে—আর দেশটা উঠ্‌বে না?"

পণ্ডিতজী হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বল্লেন—'উঠবে বৈ কি! দেশের যদি একটু লজ্জা সরম থাকে, ত তোমরা পাঁচজন ইয়ার বন্ধু মিলে, ছবার "Arise, awake" বলে তুড়ী মেরে ডাকলেই তোমাদের "জননী ভারতবর্ষ" একেবারে হুড়মুড় করে লাফিয়ে উঠবে। আর তাও বলি—বেটীরই কেমন আক্কেল! সেই যে হাজার বছর ধরে ঘাড় মুড় ভেঙ্গে পড়ে আছে, আর উঠবার নামটী নেই! রাণা সঙ্গ ডেকে ডেকে খুন হয়ে গেল—বেটীর মুখ দিয়ে একটী কথাও ফুটল না। শিবাজী, গুরু গোবিন্দ মায়ের অনেক আদরের ছেলে—তাদের ডাকে বুড়ী একবার চোক চাইতে না চাইতেই আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। তাঁরা কেউ বা ডেকেছিলেন—হিন্দীতে, কেউ বা ডেকেছিলেন মারাঠীতে। সে ডাক হয়ত

মায়ের মনে ধরে নি। এইবার তোরা সব স্বদেশী কাপড় কিনে গোল-দীঘির পাড় থেকে ইংরেজী ডাক ডাকলে হয় ত বা বেটী ভয়ে ভয়ে উঠতে পারে! তা—বেয়ে চেয়ে দেখ একবার।”

স্বদেশী সেপাই একটু যেন বিরক্ত হয়ে বল্‌লে—“দেখি, দু এক বছর নেড়ে চেড়ে। দেশটা উঠলো ত উঠলো, আর তা না হয় ত বাবার জমিদারিটা ত আর কোথাও যায় নি।”

পণ্ডিতজী বল্লেন—“এই এতক্ষণে একটা বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছ! দেশে এ রকম বুদ্ধিমানের দল যে রকম প্রবল বেগে বেড়ে উঠছে, তাতে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক রকম নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। নেপালে বেড়াতে গিয়ে সাধুদের মহলেও একবার এই রকম একটী বুদ্ধিমান দেখেছিলুম। সেবার ভারি শীত পড়েছে। একে নেপালী শীত, মাটির উপর হাতখানেক বরফ জমে গেছে, তার উপর ভূরি ভোজনের ব্যবস্থাটাও বড় সুবিধে রকমের হচ্ছিল না। তাই আমরা ধরমশালার এককোণে আগুন জালিয়ে একেবারে টুপভুজঙ্গ অবস্থায় বসে আছি, এমন সময় বেঁটে খেটে জোয়ান গোছের এক সাধু পুরুষ দরজার কাছে উঁকি মেরে বল্লেন,—ওঁ।

আমরা তাড়াতাড়ি ‘নমো নারায়ণায়’ বলে অভিবাদন করে তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি চক্ষু বুজে বললেন—ওঁ।

সব কথার উত্তরেই সাধু এক ওঙ্কার ধ্বনি করেন দেখে আমরা ত ভ্যাবাচাকা লেগে যাবার জোগাড় হয়ে পড়েছি, এমন সময় আমার এক বন্ধু বললেন—“আরে হাঁ করে দেখছিস কি? এটা আর বুঝতে পারচিস নে যে, বৈরাগ্য আর শীতের চোটে সাধুজীর মনটা একেবারে ত্রিকুটে লয় হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে! বেশ এক বাটী গরম চা কর দেখি;

তার খান কতক মোটা মোটা রুটি বানিয়ে তার সঙ্গে ঐ কুমড়োটা কেটে খানিকটা ছক্কা করে দে। একবার দেখি চেষ্টা করে সাধুজীর মনটা যদি নেমে আসে। শাস্ত্রে বলে কুমড়োর মত এমন বৈরাগ্য নাশন দাওয়াই জেলাই মুস্কিল।" তাড়াতাড়ি একবাটী গরম গরম চা করে সাধুজীর মুখের কাছে ধরতেই সাধুজী সেটুকু জঠর-নিহত ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দিয়ে আনন্দে দন্ত বিকশিত করে বল্লেন—ওঁ।

কুমড়োর ছক্কা দিয়ে দিস্তে খানেক রুটি খাবার পর সাধুজী ওঙ্কারলোক থেকে পার্থিব লোকে নেমে এসে আমার বন্ধুটীর সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেললেন। তখন সাধুজীর এই পাঞ্চভৌতিক খোলসটী কোন কুল উজ্জ্বল করেছে, খোলসের মায়িক সম্বন্ধের কোনখানে কে আছে এই সম্বন্ধে সদালাপ আরম্ভ হলো। ঘণ্টাখানেক পাঁয়তাড়া কসবার পর, সাধুজীর মনটা যখন দু তিন বাটী গরম গরম চায়ে গলে একেবারে থস্‌থসে হয়ে গেছে, তখন তিনি বললেন—"দেখ, গত বৎসর খান টান কাটার পর প্রায় শ' খানেক টাকা হাতে পেয়েছিলুম; তা একটী বিয়ে করতেই সে সব খরচ হয়ে গেল। আর মেয়েটীও ছোট; বয়স বছর ১২।১৩; আমি ভাবলুম দূর ছাই, আর কাজ নেই; ঘরে থাকলেই খরচ, তাই এক সাধুর কাছে ভেক নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। তা দেখি, দু চার বছর, ব্রহ্ম মিলল ত ভাল; না হয় ঘর ত আছেই।"

পণ্ডিতজী হেসে বল্লেন—দেখলে, ব্রহ্মচিন্তা করলে কি হয়, হিসেব বোধটী ঠিক আছে! তোমাদের দেশ-চিন্তাও ঐ রকম।

(৬)

ধর্ম্মের ব্যবসা।

মাস গেলে আমার অন্ততঃ দুটি মোণ চালের দরকার—অথচ আজ এই বারই তারিখে সকাল বেলা আটটা না বাজতে বাজতে বাক্স খুলে, দেখি আমার নগদ পুঁজি সাত টাকা সাড়ে ছ আনা! সংসারটা যে একটা অত্যন্ত খারাপ জায়গা—আমার মত নিষ্ক্রিয় পুরুষের উপযুক্ত স্থান একেবারেই নয়—এ কথা আমি শাঙ্করভাষ্য না পড়েও তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলুম। সেকালে নিত্যানন্দ গোঁসাই অবধূত মার্গ ছেড়ে যে গৃহস্থাশ্রমে ফিরে এসেছিলেন এ ব্যাপারটার কারণ খুঁজে খুঁজে আমি চৈতন্যচরিতামৃত ঘেঁটে ঘেঁটে হায়রাণ হ'য়ে গেছি—আজ বেশ দিব্য চক্ষে দেখতে পেলুম, তার আর যে কারণ থাক আর না থাক, সেকালে চাল যে সস্তা ছিল, এটা নিশ্চয়ই তার একটা প্রধান কারণ। বৈরাগ্যটা মনের এক কোণে বেশ জমাট হয়ে আসছিল; এমন কি গুন্‌, গুন্‌ করে—"কিমত্র হেয়ং" ইত্যাদি শ্লোকও আওড়াতে আরম্ভ করেছিলুম, এমন সময় পেছন ফিরে চেয়ে দেখি, সেই হেয় জীবটী চায়ের বাটীটি হাতে করে বলছেন—"নাও, চা খেয়ে নিয়ে একবার ওঠ দেখি; ঘরে চাল যে বাড়ন্ত।"

এটা তো জানা কথা—যেখানে বাঘের ভয়, সেই খানেই সন্ধ্যা হয়। এ পোড়া চাল না খেলেই নয়! হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, কে একজন মহাপুরুষ তাঁর আশ্রমে ছেলেদের ভাতের বদলে কচু খেতে দেন। ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে কচুতত্ত্বের নিশ্চয়ই খুব একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ভাতের বদলে কচুটা চালাতে পারলে এই অন্ন-সমস্যার দিনে আমাদের ইহকাল পরকাল দুই-ই রক্ষা হয়। গিন্নি কিন্তু কচুর মহিমা একেবারেই বুঝতে পারলেন না; আমাকে একটা পুড়িয়ে খেতে দিতে রাজী হলেন মাত্র। এমন বুদ্ধি না হলে আর শাস্ত্র ওঁদের বেদ পড়াতে নিষেধ করবেন কেন?

যাই হোক, ইহকাল পরকালের সমন্বয় কি করে করা যায়, এ বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন আছি এমন সময় থেলো হুঁকোটী হাতে করে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে দিতে পণ্ডিত হৃষীকেশ এসে হাজির।—"কি ভায়া, কড়িকাঠের দিকে চেয়ে টিকটিকির ল্যাজনাড়া দেখতে দেখতে কি জ্ঞান সঞ্চয় করা হচ্ছে?" আমি বল্লাম—"পণ্ডিতজী, মহা মুস্কিলে পড়েছি। সাত টাকা সাড়ে ছ আনা পুঁজি নিয়ে ত আর সস্ত্রীক সংসার-ধর্ম্ম করা চলে না। আর গিন্নির কেমন বদ্ অভ্যাস—পৌনঃপুনিক দশমিকের মত বছর বছর বংশবৃদ্ধি করেই চলেছেন। এ পরাধীন দেশে ও কার্য্যটা যে একটা মহাপাপ, এ সম্বন্ধে মহাত্মাদের মতামত সব শুনিয়ে দিলুম, তা বোঝবার নামটী নেই। মাষ্টারী করে ত আর চলে না; ছোঁড়া গুলো বলে ব্যবসা কর। আরে, বিনা মূলধনে এখন কি ব্যবসা চালাই?"

পণ্ডিতজী একটু হেসে বল্লেন—"এটা আর মাথায় এলো না! এ ধর্ম্মের দেশে আর কি ব্যবসা?—ধর্ম্মের ব্যবসা চালাও!"

আমাকে হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে পণ্ডিতজী বল্লেন—"এতে মাথা ঘামাবার তো কিছু নেই। এই দু' বছর আগে ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে দেখি এক বাবাজী একটী নোড়াতে সিঁদুর মাখিয়ে অশথতলায় বসে আছেন। তার পরের বৎসর গিয়ে দেখি সেখানে বেশ একখানি চালা ঘর উঠেছে; নোড়াটী একখানি চৌকির উপর বসেছেন, আর মেয়েরা গঙ্গাস্নান করে পুণ্যসঞ্চয় করে বাড়ী ফেরবার সময় নোড়াটীকে এক এক পয়সা প্রণামী দিয়ে পরকালের ব্যবস্থা করছেন। এ বারে যদি যাই ত নিশ্চয় দেখতে পাব যে, চালাঘর খানি কোটা হয়ে গেছে; আর নোড়ারাম বাবাজী রূপার সিংহাসনে বসে মৃদুমন্দ হাস্য করে বন্ধ্যাদের বন্ধ্যাত্ব ঘোচাবার দাওয়াই বাৎলাচ্ছেন।

বিনা মূলধনে এমন খাঁটি স্বদেশী ব্যবসা থাকতে তোমরা কেন যে ভেবে মর, তা'ত আমি বুঝতে পারি নে! এই একটা সোজা হিসেব করে দেখ না, আমাদের দেশে যত রকম রোগ, তত রকম দেবতা। জ্বরের জন্য জ্বরাসুর আছেন, সাপে কামড়ানর জন্য মা মনসা আছেন, বসন্তের জন্য মুখে ডাইমন কাটা শীতলা বুড়ি আছেন, ছেলেদের মাথা খাবার জন্য বাবা পঞ্চানন্দ ওরফে পেঁচো আছেন, কলেরার জন্য মা ওলাবিবিরও আমদানী হয়েছে—বাকি আছে শুধু ইনফ্লুয়েঞ্জা আর প্লেগ। আজকাল ইনফ্লুয়েঞ্জার যে রকম ধুম তাতে যদি একটা কাঠের বিতিকিচ্ছি রকমের মূর্ত্তি গড়িয়ে তার মুখে খানিকটা তেল, কালি আর সিঁদুর মাখিয়ে, নাকে গোটা দুই পোঁটা ঝুলিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসতে পার, তা হলে ছ মাসের মধ্যে যদি তোমার দোতালা বাড়ী না ওঠে, আর নাদুস নুদুস ভুঁড়ি না নামে তো আমার নাক কেটে দিও। এমন কি গিন্নি যদি বছর অন্তর ছেড়ে ছ মাস অন্তর তোমার বংশবৃদ্ধি করতে আরম্ভ করেন—তা হলেও খাওয়া পরার ভাবনা হবে না।"

আমি পণ্ডিতজীর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বললুম—"মহারাজ, কলি যুগে তুমিই ধন্য। ভোগ মোক্ষের সমন্বয় একা তুমিই করেছ।"

(৭)

নিরামিষ লড়াই।

সে দিন দুপুর বেলা মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বৈকুণ্ঠধামে শ্রীভগবান একটু শুয়েছেন, মা লক্ষ্মী ঠাকুরের পাতের পরমান্ন টুকু খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে পান চিবুতে চিবুতে ঠাকুরের পদসেবা করতে বসবার জোগাড় করছেন,

গরুড় পাখা দুখানি নেড়ে নেড়ে ঠাকুরকে একটু হাওয়া করে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় নারদ ঋষি এসে খবর দিলেন যে, স্বর্গ থেকে দেবতাদের একটা ডেপুটেশন এসে হাজির। লক্ষ্মী ঠাকরুণ পৌষ মাসের দিন নানা রকমের পিঠে পুলি করে খাইয়েছিলেন বলে ঠাকুরের ভোজনটা একটু গুরুতর রকমেরই হয়েছিল। এই অসময়ে বেরসিক দেবতাদের ডেপুটেশনের কথা শুনে তিনি কপট নিদ্রায় চক্ষু বুজে ঘ্যাঁ ঘোঁ করতে করতে লেপ খানি টেনে নিয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুলেন। নারদ ত একটা বাস্তু ঘুঘু। তিনি বেশ বুঝলেন যে, দেবতাদের কপালে আজ বিলক্ষণ দুঃখ আছে; তবে সে কথা ত আর দেবতাদের সামনে মুখ ফুটে বলা চলে না! যে রকম দেশ কাল পড়েছে তাতে দেবতারা হয়ত চোটে গিয়ে স্বর্গে একটা গণতন্ত্র ঘোষণা করে বসবেন। তিনি দেবতাদের কাছে ফিরে এসে গভীর সহানুভূতিসূচক সুরে বললেন—"আপনারা আপনাদের অভাব অভিযোগগুলো লিখে একখানা দরখাস্ত ঠাকুরের দরবারে পেশ করুন; আমি ঠাকুরকে সব কথা বুঝিয়ে বলে দেব।"

দেবতারা তখন বৈকুণ্ঠের উঠানে এক সভা আহ্বান করলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে দেবগুরু বৃহস্পতিকে সভাপতি করা হলো। ভীম গর্জ্জন করতে করতে বায়ু দেবতা তখন প্রথম প্রস্তাব আরম্ভ করলেন,—

"যেহেতু পিতামহ ব্রহ্মা গত রাত্রে নিদ্রা যাবার পর থেকে (বলা বাহুল্য ব্রহ্মার ১ দিন নর-লোকের হাজার বৎসর) স্বর্গে অসুর দলের উৎপাত আরম্ভ হয়েছে, এবং যেহেতু বুড়ো বয়সে অহিফেণ সেবন প্রসাদাৎ ব্রহ্মার নিদ্রার মাত্রাটা বেড়েই চলেছে, আর সৃষ্টিরক্ষার কাজ কর্ম্ম দেখা শুনা তাঁর দ্বারা হয়ে উঠে না, সেহেতু এই দেবসভা প্রস্তাব করছেন যে, বুড়োর আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে অসুরদের রাজপাট অচল করবার জন্য তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জ্জন করা হোক।"

বরুণ এই প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে দেবতার মুখ বর্ষণ করতে করতে কেঁদে সভাস্থল ভাসিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন—"অসুরেরা যে রকম ব্যাদড়ামি আরম্ভ করেছে, তাতে আমরা অমর যদি না হতুম ত এতদিন আমাদের দেবত্ব ঘুচে প্রেতত্ব প্রাপ্ত ঘটত। বলেন কি মশায়, একটু মুখ খুলে কথা কইবার জো নেই—অমনি জেলে পুরে দেয়; দেবলোকের টাউন হলে একটা মিটিং করতে গেলে লাঠির গুঁতোয় তা ভেঙে দেয়। রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে শোবার জো নেই, ফিস ফিস করে গিন্নির সঙ্গে কথা কইলেই বলে 'কন্‌স্পিরেসি' করছ। এ সম্বন্ধে আবেদন নিবেদন অনেক করা সত্ত্বেও যখন আটটা রম্ভা ছাড়া আর বেশী কিছু পাওয়া যায় নি তখন দুঃখের সহিত অসুর বাবুদের জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করা আর আমাদের পোষাচ্ছে না। এতে তাঁদের গুঁতোর চোটে আমাদের প্রাণ যায়—ত কি আর করব, না হয় ভিক্ষে মেগে খাব।"

অগ্নি হড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে তাঁর সপ্তজিহ্বা লক্ লক্ করতে করতে বলে উঠলেন—"দাসত্বের রজ্জু আমাদের জালিয়ে দিতেই হবে। দুর্ভিক্ষই হোক আর মহামারীই হোক, ম্যালেরিয়াই হোক, আর ইনফ্লুয়েনজাই হোক, আমাদের এই তেত্রিশকোটীর প্রাণ যখন বেরুবে না—তখন আর আমাদের কিসের ভয়? আপনারা যদি আমার সাহায্য করেন, বায়ু যদি একটু অনুকূল হয়ে বইতে থাকেন, ত আমি ত একাই অসুর-পুরী পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারি—এর জন্য এত কান্নাকাটিই বা কেন, সহযোগিতা-বর্জ্জনের বায়নাই বা কেন?"

অগ্নির এই রকম অসাত্ত্বিক প্রস্তাব শুনে ভয়ে দেবতাদের মুখ শুকিয়ে এল। যমরাজ সভাপতির কাণের কাছে গিয়ে বলে দিলেন,—"সুরটা বড় চড়া হয়ে যাচ্ছে না? শেষে কি এই বুড়ো বয়সে আমাকেই নিজের বাড়ীতে যেতে হবে?"

বায়ু চন্দ্রকে কি একটা ইঙ্গিত করে দিতেই তিনি মধুর হাসিতে সভাস্থল উজ্জ্বল করে বলতে লাগলেন—"দেখুন ভ্রাতৃবর্গ, আমরা যখন দেবতার জাত তখন আমরা মুখে যাই বলি, আমরা যে একেবারে হাড়ে হাড়ে সাত্ত্বিক, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই। সুতরাং মারামারি রক্তারক্তি প্রভৃতি আসুরিক ব্যাপারগুলোর আলোচনা আমাদের মধ্যে যত কম হয় ততই ভাল। আমরা যে অসুরবৃন্দের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন করতে যাচ্ছি, এতে যেন আমাদের মনে বিদ্বেষ বুদ্ধির ছিটে ফোঁটাও না আসে। আমি যে এতকাল চন্দ্রায়ণ ব্রত করে তপঃশক্তি সংগ্রহ করেছি তার ফলে অসুরদের প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে দেব; বিনা রক্তপাতে কার্যোদ্ধার হবে।"

চটপট করতালিধ্বনির মধ্যে চন্দ্রদেব আসন গ্রহণ করতেই শ্রীমান কার্ত্তিকের নবীন গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বল্লেন—'প্রেমের বন্যা টন্যা যা শোনা গেল তা যে অতি উপাদেয় জিনিস তাতে আমার সন্দেহ মাত্র নেই; কিন্তু আপনাদের এই প্রেমের বন্যা আসবার আগে অশ্রুর বন্যায় স্বর্গরাজ্য না ভেসে যায়—তার ব্যবস্থাও যেন করা হয়। অসুরদের সঙ্গে পূর্ব্বে থেকেই আমার একটু আলাপ পরিচয় যে আছে, তা' ত আপনারা সকলেই জানেন। তারকাসুরকে যখন প্রেম শেখাবার দরকার হয়েছিল, তখন ত চন্দ্রদেব অমৃতভাণ্ড ছেড়ে উঠতে চান নি—আমাকেই সে কাজটা করতে হয়েছিল। আমি যে উপায়ে তা করেছিলুম সেটা যে ঠিক কোপনী এঁটে নামাবলী গায়ে দিয়ে আর চরণামৃত খেয়ে নয়, তা বোধ হয় আর বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই। আপনাদের যে রকম ব্যাপার দেখছি, তাতে দেব-সেনাপতির কাজ যে আমার দ্বারা চলবে তা ত মনে হয় না। লোটা কম্বল নিয়ে এ বয়সে ময়ূর চেপে কীর্ত্তন করে বেড়ান আমার পোষাবে না।"

ইন্দ্রের ছেলে জয়ন্ত সেম কলেজ ছেড়ে দিয়ে মহা ফকোড় হয়ে উঠেছিল। সে কোণ থেকে চীৎকার করে বলে উঠল—"হিয়ার হিয়ার।"

সভাস্থলে তুমুল গোলমাল আরম্ভ হল। নানারকম অসাত্ত্বিক সম্ভাষণের পর উভয় পক্ষের মধ্যে টেবিল, বেঞ্চ ছোড়াছুড়ির সম্ভাবনা দেখে বুদ্ধিমান দেবগুরু বললেন—"আচ্ছা এ বিষয়টা মীমাংসার ভার সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠপতিকে দেওয়া হোক। তিনি যখন ত্রিগুণাতীত, তখন এই স্বত্ব, রজের দ্বন্দ্বের মীমাংসা তিনি করে দিলেই ভাল হয়।"

* * * * * *

এদিকে কোলাহল শুনে নারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় তিনি চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞাসা করলেন—"নারদ, ব্যাপার কি? এত গোল কিসের?"

নারদ একটু মুচকি হেসে বললেন—"প্রভুপাদ! এবার দেবতাদের একটা নতুন ফরমাইস আছে; আপনাকে এবার নিরামিষ লড়াই করতে হবে।"

চক্রপাণি ভগবান বললেন—"ওদের রকম বে-রকমের আবদারের চোটে আমার কানে তালা ধরে গেছে। ওদের বলে দাও যে ও রকম ন্যাকামি শোনবার আমার সময় নেই।"

(৮)

ন'মাসে স্বরাজ।

গোপাল দা'র ছেলেটী লাফাতে লাফাতে এসে বল্লে—"বাস্, হয়ে গেল!"

"কি হলো রে, পুঁটে ?"

"কি আবার ?—স্বরাজ! আর ন'মাস বাকি বৈত নয়। তার পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ছেলেটীর যে রকম বিষম উৎসাহ, তাকে চুপ করে বসিয়ে রাখাই দায়। আমি পকেট থেকে একখানা বিস্কুট বা'র করে তার হাতে দিতেই সে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"বিলিতি নয় ত ?" তার উত্তর পাবার আগেই টপ্ করে মুখে ফেলে দিয়ে আমার কাছে এসে বসল। আমি তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞাসা করলাম—"হাঁ, পুঁটু, স্বরাজ ব্যাপারখানা কি রে ?"

ছেলেটী আমার দিকে বেশ একটু অবজ্ঞা ভরে চেয়ে বল্লে—"ও! তাও জানেন না বুঝি ? স্বরাজ মানে কি জানেন,—অর্থাৎ কি না— আপনি গোলদিঘীতে যান নি বুঝি ?"

"না, বুড়ো মানুষ কি করে যাই বাবা ?"

"ওঃ! তাই বটে! সেখানে কত লোক এসে যে রোজ স্বরাজ করে যায়। সেখানে কত জন রোজ বিকেলে এসে দেশের জন্যে প্রাণ দিয়ে যায়; আর বলে যে ন মাস এই রকম করতে পারলেই পাকা স্বরাজ হয়ে যাবে। তারা ত আমাদের বলে দিলে ইস্কুল ছেড়ে সব বেড়িয়ে পড়। আমরা পঞ্চাশ জন ছেলে টিফিনের সময় পালিয়ে এসেছি। ফোর্থ মাষ্টার

বেটা [illegible] এসেছিল ; আমরা 'স্বরাজ কি জয়" বলে তাকে ঢিল মেরে চম্পট দিয়েছি।"

ছেলেটী তড়াক করে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তাত থেকে জ্যাকা-আড়ি ইস্কুলে ছুটে গিয়ে মাষ্টারের চেয়ারে আলপিন গুঁজে রাখবার দায় থেকে যে সে অব্যাহতি পেয়েছে—এইটাই কি কম লাভ ? ইস্কুল ছাড়তে না ছাড়তে তার মুখের ফ্যাকাসে ভাবটা সেরে গিয়ে বেশ যেন রক্তের আভা দেখা দিয়েছে। একটা মানুষ গড়তেই যখন ১০ মাস লাগে, তখন ন'মাসে একটা জাত গড়ে উঠবে—এটা বিশ্বাস করি আর না করি—এই ন'মাসে যে ছেলের বাপের ডাক্তার খরচ অনেকটা কমবে এ কথা আমি দিব্যি করে বলতে পারি।

পুঁটুরামের ফুর্ত্তি দেখে আমারও বৈরাগ্যগ্রস্ত হাড় ক'খানা একটু নড়ে চড়ে উঠল। ভাবলুম "স্বরাজ কি জয়" বলে আমিও একবার বেরিয়ে পড়ে গোলদিঘীতে গিয়ে প্রাণটা দিয়ে আসি। রাস্তায় দেখা হলো আমাদের ক্ষুদিরামের বড় ছেলেটীর সঙ্গে। ছেলেটী অতি সৎ ; ব্যাদড়ামী করবার বুদ্ধিটুকু পর্য্যন্ত তার নেই। আমাদের কুইনের ছাপ-মারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকায় পাক খেতে খেতে বেচারী বিনা দোষে ফোর্থ ইয়ারে পৌঁছে গেছে। এবারে বি, এ, পাশ দিয়ে বাঙ্গালী জীবন সার্থক করবার চেষ্টায় কি পর্য্যন্ত জমা দিয়েছে, এমন সময় এই স্বরাজের ফাঁসাদে ফেঁসে গিয়ে বেচারী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

"না যাইলে রাজা বধে যাইলে ভুজঙ্গ,
রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।"

এদিকে কলেজে গেলে ছেলে-মহলে মুখ দেখাবার জো নেই, ওদিকে—এখনও ন'মাস দেরী। ছেলেটী একটু আমতা আমতা করতে করতে জিজ্ঞাসা করলে—"কি বলেন, কলেজ ছাড়ব না কি ?'

কেন জানি না আমার ইচ্ছে হ'লো ছেলেটাকে একটা থাপ্পড় দিয়ে দিই। সে কুপ্রবৃত্তিটা সংযত করে জিজ্ঞাসা করলুম—

"নিজে কি ঠিক করলে ?"

ছেলেটি বললে—"ভাবছি সবাই যখন বলছে যে, ন' মাসে স্বরাজ পাওয়া যাবে, তখন না হয় একবার ছেড়ে দিয়েই দেখি।"

আমার হঠাৎ বক্তৃতা পেয়ে গেল। বললুম—"স্বরাজ কি ভীমনাগের দোকানের কাঁচা গোল্লা যে অপরে তোমাদের তা গিলিয়ে দেবেন ? আগে বলতে স্বরাজ ইংরেজ দেবে, এখন বলছ স্বরাজ গান্ধী মহারাজ দেবেন। দশ বিশ লাখ গোলাম নিয়ে যদি একটা স্বাধীন জাত গড়ে ওঠা সম্ভব হয়, ত ন'মাসে কেন, ন' দিনেও তা হতে পারে। কিন্তু স্বরাজ পাওয়ার সঙ্গে মানুষ হওয়ার যদি কোন সম্বন্ধ থাকে, ত তোমাদের কলেজ, আর টেক্‌ষ্ট বুক, আর প্রোফেসরগুলোকে বস্তায় পুরে গঙ্গায় ভাসিয়ে না দিলে তা হবার ত কোন সম্ভাবনা দেখছি নে। স্বরাজ পেতে গেলে আগে স্বরাট হতে হবে। নিজের ভিতরে যা নেই, তা কেউ তোমায় দিতে পারবে না। তোমার মত সোণার চাঁদকে নিয়ে যদি স্বরাজ গড়া চলে, ত বাওয়া ডিমে তা দিলেও বাচ্ছা ফুটবে।"

আমার মত শান্ত জীবের এ রকম আকস্মিক আস্ফালন দেখে ছেলেটী যেন ভ্যাবাচাকা মেরে গেল। আমারও হঠাৎ মনে পড়ে গেল—

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং—"ইত্যাদি। সীস্ দিয়ে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে গোলদিঘীর দিকে চললুম। রাস্তায় শুনলুম, একটা দোতালা বাড়ী থেকে সন্ধ্যার বাতাস কাঁপিয়ে খুব করুণ কণ্ঠে কে গাইছে—

"ওগো যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা"

আমি বললুম—"ঠিক কথা; তা হলে বাজে বক্তৃতায় কিছু হবে না।"

(৯)

ক্রন্দোলন।

পণ্ডিত হৃষীকেশ সন্ধ্যাবেলা অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে বসে বসে তামাক টানছেন, এমন সময় বিষণ্ণ বদনে গোপাল দা' এসে উপস্থিত। তাঁর গোলগাল মুখখানি একেবারে ভাবনায় প্রায় তিনফুট ছয় ইঞ্চি ঝুলে পড়েছে। তক্তপোষের এক কোণে বসেই তিনি বলে উঠলেন—"কি বিপদেই পড়া গেছে!

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে

কাল হোল তাঁতির এঁড়ে গোরু কিনে।

ছেলেটা পড়াশুনা কচ্ছিল ভাল। আজ হপ্তা খানেক হলো বইগুলো টেনে ফেলে দিয়ে ঘাটে মাঠে মিটিং করে বেড়াচ্ছে। নাওয়া খাওয়া চুলোয় গেছে; আজ সিনেট হলে ধরনা দিয়ে পড়ে থাক; কাল উপোস কর, পরশু শোকসভা কর—ভাল ফ্যাসাদ সব জুটেছে!"

পণ্ডিত হৃষীকেশ চোখ বুঁজেবুঁজেই বললেন—"তা, ত হবেই। ইঙ্গবঙ্গ যে এবার রজস্তম যুগ পার হয়ে সত্ত্বের কোঠায় এসে ঠেকেছে। আর একটু পরেই নির্ব্বাণ। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"সে আবার কি রকম?" পণ্ডিতজী বললেন—"ত্রিগুণ ভেদে ভগবানের পর্য্যন্ত রূপভেদ হয়—হিঁদুর ছেলে এ কথাটা ত জান? সুতরাং সত্ব রজঃ তমঃ গুণের চাপে ইঙ্গবঙ্গ politics যে রকমারি রূপ ধরবে এ আর বেশী কথা কি! প্রথম যখন ফিরিঙ্গি সভ্যতা এদেশে এসে আমাদের বাপ পিতামহ'র নাম দিলে ভুলিয়ে, তখন আমরা ইংরেজের মুখের দিকে দেখতুম আর ভাবতুম—হায়, হায়! ভগবান্ কি ভুল করেই আমাদের এ দেশে জন্ম দিয়েছেন। সে ভুল শোধরাবার জন্যে একদিকে যেমন আমরা সাবান মেখে, আমা-

ঘসে, রাঁদা বুলিয়ে চামড়াটাকে কটা করবার চেষ্টায় ফিরতে লাগলুম, অপর দিকে তেমনি ইংরাজীতে হেসে, ইংরাজীতে কেসে, ইংরাজীতে স্বপন দেখে মনটাকেও যতদূর পারি ফিরিঙ্গি মার্কা করে তুলতে লাগলুম। আমরা যে ইংরেজ নই, এতে আমরা তখন মনে মনে বেশ একটু লজ্জিত। এইটেই হলো তোমার সেকেলে কংগ্রেশী যুগের মনস্তত্ত্ব। আমাদের রাজনীতির এটা তামস-যুগ। যথাসাধ্য ইংরেজের মত হওয়া সত্বেও যখন ইংরেজ আমাদের হাতে রাজপাট ছেড়ে দিলেনা, তখন আমরা আরম্ভ করলুম আন্দোলন আর "ক্রন্দোলন"।

"ক্রন্দোলন!—ওটা কি জিনিস, পণ্ডিতজী?"

"আরে ওটা আর বুঝলে না, ক্রন্দন আর আন্দোলন এক সঙ্গে জমাট বেঁধে গিয়ে যা সৃষ্ট হয় তার নাম ক্রন্দোলন। ওটার সার মর্ম্ম হচ্ছে এই—"বাবা, ইংরেজ—তোমার চেয়ারের পাশে আমাদের একটু বসতে জায়গা দাও, বাবা। উঃ অত ঠেসে ধর কেন? আমাদের যে দম বেরিয়ে যাচ্ছে! আরে বাপ! অত দাঁত খিঁচুচ্চ কেন? দেখ না, আমারও লেখা পড়া শিখে প্রায় তোমার মত হয়েছি; একটু পাউডার মাখলে আর চেনবার জো নেই।"

গোপাল দা' এই সময় জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কি বলতে চান, ও থেকে কিছু আমরা পাই নি?"

পণ্ডিতজী বল্লেন—"পাবোনা কেন, যথেষ্ট আক্কেল পেয়েছি। তাই ত ১৯০৫এর পর এল রাজনীতির রাজসিক যুগ। তখন আমাদের অন্তরের দেবতাটী অন্ধকার মূর্ত্তি ছেড়ে রক্তমূর্ত্তি ধরেছেন। কাজেই তখন "ক্রন্দোলনের" বদলে আরম্ভ হলো—গুঁতো। তখনকার মূলমন্ত্র হচ্ছে—"দে ডাণ্ডা, দে ডাণ্ডা।" ফিরিঙ্গি সভ্যতার উপর চোটে গিয়ে আমরা তখন বাইরের সাবান, বুরুষ, ছেঁড়া পেণ্টুলান টেনে ফেলে দিয়েছি

বটে, কিন্তু মনের ঢংটা বদলায়নি ? মনটা তথনও বলচে—'একবার ওদের শীল, ওদের নোড়া নিয়ে ওদের দাঁতের গোড়ায় লাগাতে পারলে হতো ভাল।' শীল নোড়া যথন পাওয়া গেল না, তথন আমরা অভিমান ভরে হয়ে দাঁড়ালাম সাত্ত্বিক।

এই যে গোস্বামী মতে ভারত উদ্ধার আরম্ভ হয়েছে এর মূলমন্ত্র হচ্ছে :—স্বরাজ যদি না দাও, ত তোমাদের সঙ্গে আড়ী ; ও কালামুখ আর দেখবো না।—এটা হচ্ছে ইঙ্গবঙ্গের সাত্ত্বিক যুগ—তবে যদি না চটো, দাদা, ত বলি—তামস-সাত্ত্বিক।"

আমার কথাটা ভাল লাগলো না ; জিজ্ঞাসা করলুম—"তোমার ঐ খুঁতধরা রোগটা বুঝি আর গেল না ? এত ত্যাগ-সংযম থাক্‌তে ব্যাপারটা তামস-সাত্ত্বিক হতে গেল কেন ?

পণ্ডিতজী—"তিতিক্ষা সাধনই যদি সাত্ত্বিকতার ষোল আনা হতো, তা' হলে আর ভাবনা কি ? দেখছো না ব্যবস্থাগুলো প্রায় পুরোপুরি 'নেতি, নেতি' ধরণের ? এ করো না, ও করো না—কিন্তু করতে হবে কি, তার একটা স্পষ্ট ধারণা কারও নেই। এর ফল হতে পারে মিথ্যাকে ছাড়া, কিন্তু সত্যকে পাওয়া নয়। যম, নিয়ম, উপবাস, হবিষ্য—অবিশ্যি জিনিস ভাল—তবে পঙ্গু। ভগবান কি Sunday schoolএর হেড মাষ্টার যে খ্রীষ্টানী দশ আদেশের একটু উনিশ বিশ হলেই আমাদের নরকস্থ করে দেবেন ? একটা জাত যথন নিজের শক্তির আস্বাদন পেয়ে বেঁচে উঠে তথন কি কতকগুলো নিষেধের বোঝা মেনে নিয়ে চলে নাকি ? নিজেদের যে আমরা চিনি নি তার প্রমাণ ত পদে পদে পাচ্ছি। সব নেতাদের জিজ্ঞাসা কর যে ইংরেজ চলে গলে তাঁরা দেশটাকে কি রকম করে গড়তে চান। তাঁদের ধারণাগুলোর পনের আনা ভাগ ফিরিঙ্গিস্থান থেকে ধার করা—ঐ পার্লামেণ্ট, ভোট, ব্যালট আর মেজরিটি।

আমাদের মাথার ভিতরকার স্বরাজের সঙ্গে দেশের নাড়ীর যোগ আছে কি না তা এখনও আমরা ভেবে দেখিনি। এই যে ভাবের তুফান উঠেছে, এতে লোকের মনগুলোকে দেশের দিকে ফেরাবে; এইটাই এর কাজ। এটা পুরাণোকে ভাঙ্গবে, কিন্তু নতুন ছকে গড়বে কি? তার ত কোন লক্ষণ দেখছি নে; সবাইকার অবস্থা দেখে মনে হয় যেন তারা ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলছে; চলবার পথ পাচ্ছে না। তাই ত মনে ভয় হয়—আবার একটা অকালবোধন হলো নাকি? তমের পর রজঃ এল, তার পরে এলেন সত্ব—শেষে নির্গুণে গিয়ে ঠেলে উঠবে না ত?"

আমারও একটা ভাবনা হলো। জিজ্ঞাসা করলুম—"এই 'নেতি, নেতি'র রাস্তা ভেঙ্গে স্বরাজে গিয়ে পৌছিবে ক'জন?"

পণ্ডিতজী বললেন—"মহাপ্রস্থানে যাত্রা করলেন ত পঞ্চ পাণ্ডব মিলে; শেষে স্বর্গের দরজায় গিয়ে যখন হাজির হলেন—তখন বাকি শুধু মহারাজ যুধিষ্ঠির আর তাঁর কুত্তা।"

---

(১০)

মন আমার।

বয়স তখন উনিশ কি কুড়ি। একদিন সন্ধ্যা বেলা একলা পেয়ে মনকে জিজ্ঞাসা করলাম—'মন, কি চাও?'

মন শুক্‌নো মুখে চুপ কোরে বসে রইল। কথার কোনো উত্তরই দিলে না।

সেবার পাসের পড়া পড়চি। সবাই আমাকে বলত ভাল ছেলে।

জিজ্ঞাসা করলাম—'মন, একবার ফুটিয়ে পাসটা কোরে নেবে? বেশ ত গেজেটের ডগায় নাম উঠবে, সোনার মেডেল পাবে, খোদ লাটসাহেব এসে হাতে সার্টিফিকেট দেবে, ছেলে মহলে হৈ হৈ পড়ে যাবে!"

মন একটু ম্লান হাসি হেসে বললে—'পোড়া কপাল! পেয়াদার আবার শ্বশুর বাড়ী, গোলামের আবার বিয়ে!'

লেখাপড়ার গুমরটা মনে মনে একটু ছিল; সেখানে ঘা খেয়ে একটু শিউরে উঠলুম।

"তবে কি চাও, মন,—টাকা? কল্‌কাতার বুকের উপর প্রকাণ্ড একখানা সাদা মার্ব্বেল পাথরে বাঁধান বাড়ী, চমৎকার একখানা মোটর, আর ব্যাঙ্কে লাখ কতক—?" কি বল?

মন আমার মুখও তুললে না। শুধু বল্লে—একলা মানুষ, ও সব নিয়ে আমি করব কি? দুবেলা দুমুঠো ভাত, আর মাথা গোঁজবার একটু জায়গা পেলেই হ'ল।"

মনের এই উদাস উদাস ভাব দেখে ভাবলুম মন আমার বুঝি লুকিয়ে 'লভে' পড়েছে। একটু ইতস্ততঃ কোরে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলুম—"একটী টুকু টুকে রাঙ্গা বউ বিয়ে করবে? খাসা মেয়ে! বেশ চার দিক আলো করে ঘুরে বেড়াবে!"

মন আমার হাই তুলে বললে—"নিজের বোঝাই বইতে পারিনে—তার উপর আবার একটা মেয়ে!"

রোগটা ঠাওরাতে পারলুম না।

* • • * *

সেদিন সন্ধ্যাবেলা গোলদীঘির ধারে একজন প্রকাণ্ড স্বদেশী পাণ্ডার লেকচার শুনে খুব খানিকটা হৈ চৈ করে বাসায় এসে খেয়ে দেয়েই শুয়ে পড়িছি। খোলা দোর জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না বিছানার উপর যেন

ঢেউ খেলছে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা টেরও পাইনি। আধা রাতে হঠাৎ যেন বুকটা ডুড় ডুড় করে উঠল। ঘুম ভেঙে দেখি মনটা আমার ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। আঃ, সে কি কান্না! বুকটা যেন মুচড়ে মুচড়ে নিঙড়ে নিঙড়ে কান্নার ধারা ছুটেছে। আমাকে জাগতে দেখে মন আমার খানিকটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চুপ করলে। অনেকক্ষণ গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"হ্যাঁরে, তোর কি হয়েছে বল্‌না? কি করলে তুই সুখী হোস?"

আবার কোঁপানি সুরু হলো। আমি ভাবলুম বুঝি বক্তৃতা শুনে মনের আমার নেতা হবার সাধ হয়েছে। বললুম—"হ্যাঁরে, ছেলেদের সর্দ্দারি করবি? কত হাততালি পাবি, ফুলের মালা পাবি, খবরের কাগজে তোর নামে প্রবন্ধ বেরুবে; আর এখন থেকে সুরু করলে কালে লাট সাহেবের সভার সভ্যও হতে পারিস। কংগ্রেসের সভাপতি হওয়াও বিচিত্র নয়—অথচ খরচ একটি পয়সা নেই! কি বলিস?"

মন আমার নাকটা সিঁটকে উঠল। মুখটা আমার চেপে ধরে বল্‌লে —"ওগো, রক্ষা কর, রক্ষা কর—আমি কি ছ্যাঁচোড় না দাগাবাজ যে আমায় ফক্কিকারি দিয়ে ভোলাচ্চ?"

কি বিপদ! তবে কি মনের আমার বৈরাগ্য হল? জিজ্ঞাসা করলুম— "তুই কি সাধু হবি নাকি? চল, গেরুয়া ছুবিয়ে নিয়ে তা'হলে বেরিয়ে পড়ি। একটা আলখেল্লা আর কমণ্ডলু নিয়ে আরম্ভ করা যাক; শেষে চেলা টেলা জুটলে একটা ভাল জায়গা দেখে মঠ বেঁধে বসা যাবে'খন।"

মন আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চুপটি মেরে হাঁ করে চেয়ে রইল; শেষে একটু ঘাড় নেড়ে শুধু বল্‌লে—"ছি!"

* * * *

বাঙ্গালীর ছেলে সেপাই হবে—এ কথা তখন কে ভেবেছিল? কিন্তু

আজ তা'ও হলো। ১৯১৫ সালে যে ফরাসীর সঙ্গে জর্ম্মাণের যুদ্ধ হবে, আর আমি ফরাসী পল্টনে ভর্ত্তি হয়ে লড়াই কর্ত্তে যাব—এ কথা আমার ভাগ্য-বিধাতা ছাড়া আর কে আগে জানত? ভাল ছেলে হওয়া বা বড় লোক হওয়া আমার পোষাল না। আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে এসেছি। যত দূর দেখেছি, সব ফরাসী জাতটা যেন একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। ঘর ছেড়ে, বৌ ছেড়ে, ছেলে ছেড়ে, ধন ঐশ্বর্য্য ছেড়ে—যুবা বুড়ো, ন্যাংড়া, নুলো সব রাইফেল কাঁধে ছুটেছে। নিশান উড়ছে, বিউগল বাজছে, আর কান ফাটিয়ে ঐ এক গান উঠছে—"Allons enfants de la Patrie" * * * আজ আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টির ধারা ছুটেছে আর আমরা মাঠের পর মাঠ ভেঙ্গে ডবল কদমে চলেছি। মাঝে মাঝে আকাশ চিরে বিজলী চমকাচ্ছে; দূরে জর্ম্মানের তোপের আওয়াজ বেশ স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে।

মনটা আমার ফরাসী সেনার সঙ্গে সঙ্গে বেশ তালে তালে পা ফেলে চলেছে। হঠাৎ—কড়াং—ং!—কান ফাটিয়ে, চোখ ধাঁধিয়ে, কোথা থেকে একটা শেল আমাদের খুব কাছাকাছি এসে ফাটলো। যে যেখানে পারলে গুড়ি সুড়ি মেরে মাটীর উপর পড়লো। পাশে একটী ফরাসী ছেলে সেই যে পড়লো আর উঠলো না। শেলের এক টুকরো তার মাথায় এসে লেগেছিল।

মরণকে এত কাছে পেয়ে প্রাণটা যেন উন্মাদনায় ভরে গেল। মনে পড়লো সেই মেসের ছেলেগুলো, যারা পাশ করেছে, আর বেঁচে মরে আছে। বাড়ীতে বুড়ী মা আর ছোট ভাইটা—আসবার সময় যার গলা জড়িয়ে ধরে এ পাষাণ চোখেও জল এসেছিল—দূর হোক গে!

ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলুম—মন আমার যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তার চোখ দুটো যেন বিদ্যুতের মত চকচক

করছে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলুম—"কি মন, একবার ঝাঁপিয়ে পড়বে?"

মন আমার একটা পাগলের মত অট্টহাসি হেসে বল্‌লে—"মরণের লোভ যে কত বড় তা আমি জানি; কিন্তু যাদের জন্যে মরলেও সুখ হতো, এরা ত আমার তা' নয়!"

* * * *

"তবে চুলোয় যা"—বলে আমি চলতে আরম্ভ করধুম। সেই যে চলেছি, আজ অবধি চলা আর আমার শেষ হলো না। যুদ্ধ শেষ হবার পর শুনলুম ইউরোপ নাকি একটা জাতিসংঘ গড়ে জগতে সত্যযুগ আন্‌বে। মনকে জিজ্ঞাসা করলুম—"দেখতে যাবি না কি রে?" মন বল্‌লে—"ধ্যাৎ, ওটা ত জাতিসংঘ নয়, ও হলো মাতব্বরদের বদ্‌জাতি সংঘ।"

তুই যে আমার বেজায় আবদেরে, মন!

চললুম রুশিয়ায়—সেখানে নাকি সব ভেদাভেদ রক্তের নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে লেনিন মানুষকে সমান করে গড়বে। গিয়ে দেখলুম, হাঁ—একটা নতুন রকমের কল বসেছে বটে। মানুষকে সেই কলের মধ্যে ফেলে, কারও মাথাটা ছেঁটে দিয়ে, কারও ঠ্যাংটা ভেঙ্গে দিয়ে সকলকে সমান করে গড়বার চেষ্টা হচ্ছে বটে। যার নাকটা একটু বড়, দাও তার নাকটা ইঞ্চি খানেক কেটে; যার চোখ দুটো একটু গোল গোল, দাও তার চোখ দুটো ছুরি দিয়ে পটল-চেরা করে। একেবারে ভীষণ রকমের সাম্য! কর্ত্তার যদি জ্বর হয়, ত সবাই খাও সাগু; কর্ত্তা যদি পাশ ফিরে শোন, ত কেউ চিৎ হয়ে শুতে পাবে না। শুন্‌লুম এর নাম Commune! মন আমার খানিকটা চুপ করে থেকে থেকে বলে উঠল—বাপ!

* * * *

ছুট, ছুট, ছুট।—একেবারে ছুট্‌তে ছুট্‌তে তুর্কিস্থান, কাবুল, পাঞ্জাব,

হিন্দুস্থান ভেদ করে বাংলার মাটিতে ন্যাংটা হয়ে এসে দাঁড়িয়েছি। আজ কোথায় তুমি, আমার স্বপ্নের বাংলা ?—কোথায় তুমি, মা! দশ হাতে দশ প্রহরণ নিয়ে অনন্ত ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হয়ে তুমি একদিন বাঙ্গালী সাধকের মানস-পটে এঁকে উঠেছিলে, আর আজ দেখি সবাই আমারই মত জীর্ণ, ক্লিষ্ট, ক্ষতবিক্ষত দেহ প্রাণ নিয়ে পরের পায়ে ধরণা দিয়ে পড়ে আছে।

ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলুম মন আমার চোখ বুঁজে একেবারে চুপ হয়ে গেছে। শুধু অন্তর্য্যামিনীর পদপ্রান্তে তার কাতর প্রার্থনা উঠেছে—একবার, এসো মা, এসো মা!

---

(১১)

পুঁটের স্বরাজ।

সকাল বেলা উঠে পুকুর ঘাটে মুখ ধুতে গিয়ে দেখি পাড়ে একটা খেজুর গাছের তলায় তিন চারটে ছোট ছোট ছেলে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর যে মিন্সে খেজুর গাছে তাড়ী দেয় সে রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখ হয়ে আস্ফালন জুড়ে দিয়েছে! কি ব্যাপার ?—হাত মুখ ধোয়া ত চুলোয় গেল। তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি তাড়ীর কলসীটা ফুটো হয়ে গেছে আর তা থেকে টস্ টস্ করে তাড়ী পড়ছে। মুখুজ্যেদের পুঁটের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে তাড়িওয়ালা বল্লে—"দেখুন, দেখি, কর্ত্তা মশাই, ঐ ছোঁড়াটা ঢিল মেরে আমার কলসীটা ফুটো করে দিয়েছে।" ভাবলুম বুঝি হাতে হাতে ধরা পড়ে পুঁটু একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়বে। কিন্তু

পুঁটু সে ছেলেই নয়! সে তার দেড় হাত পরিমাণ দেহটাকে বেঁকিয়ে দর্শকের মত করে ঘাড়টাকে একটু বাঁ দিকে হেলিয়ে উত্তর দিলে—"বেশ করেছি ভেঙ্গেছি; সবুর কর তুই ন' মাস। তার পর স্বরাজ হলে তোকে ধরে ঐ খেজুর গাছে ফাঁসি দেব।"

তখন আমার জ্ঞান-নেত্র ফট্ করে ফুটে উঠল। ঠিক ঠিক! এটা তা'হলে স্বরাজেরই প্রথম অধ্যায়! কাল দেখছিলাম বটে একটা নাকে সোণার চশমা দেওয়া "My dear" রকমের নবীন ছোকরা সিন্ধু মণ্ডলের চণ্ডীমণ্ডপে বসে বসে একখানা খপরের কাগজ পড়ে ছেলেদের কি শোনাচ্ছিল। কল্‌কাতা থেকে এসেছে নাকি?

আমি ত তাড়াতাড়ি তাড়ীওয়ালাকে একটু ঠাণ্ডা করে, ছেলেগুলোকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে এলুম। মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করে জিজ্ঞাসা করলুম—"হ্যাঁরে পুঁটে, সকাল বেলা পাঠশালে না গিয়ে বুঝি তাড়ীর কলসী ভেঙ্গে বেড়ান হচ্ছে?"

পুঁটে তার আড়াই ইঞ্চি মুখখানা আমার চেয়েও গম্ভীর করে উত্তর দিলে—"ও নবীন পণ্ডিতের পাঠশালায় ত আমরা আর যাব না; আমাদের যে ন্যাশনাল পাঠশালা হয়েছে।"

আমি ত হাঁ করে ফেললুম। বল্লুম—"আরে মোলো; পড়িস ত শিশুশিক্ষা; তার আবার ন্যাশনাল পাঠশালা কিরে?"

পুঁটে হারবার ছেলে নয়। সে বল্লে—"আজ্ঞে হ্যাঁ; এইবার থেকে যে আমাদের ন্যাশনাল শিশুশিক্ষা পড়ান হবে।"

আঃ খেলে কচুপোড়া! ন্যাশনাল শিশুশিক্ষা! বাপের বয়সে তা ত কখন দেখিনি। পুঁটেকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ন্যাশনাল পাঠশালাটা বসবে কি খেজুর গাছের তলায়? ওখানে গিয়ে কলসী ভাঙ্গতে গেলি কেন?"

আমি বুঝলুম ভেতরে একটা কিছু কথা আছে। অন্ধকারে ঢিল মারা

গোছ করে জিজ্ঞাসা করলুম—"ঐ সিদু মণ্ডলের চণ্ডীমণ্ডপে যে বাবুটী এসেছেন—আচ্ছা, কি নাম ভাল—"

পুঁটে ফট্ করে বলে ফেল্‌লে—"রেবতী বাবু!"

আমি মনে মনে একটু হেসে বললুম—"হাঁ। রেবতী বাবু—তিনিই ন্যাশনাল পাঠশালা খুলচেন—না? তা বেশ—কাল তিনি কি বললেন তোদের?"

পুটে নীরব। দেখলুম ছেলেটা একটা জাতকাটা বিচ্ছু।

হঠাৎ দাঁত মাত খিচিয়ে বলে উঠলুম—"বলবি নে পাজি? দাঁড়াও একবার লাগাচ্চি জল-বিচুটি।"

পুঁটের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল যদু পোদ্দারের ছেলে নন্দদুলাল। সে একবার পুঁটের মুখের দিকে চেয়ে দরজার দিকে ফিরে দেখলে। দরজাটা বন্ধ—পালাবার রাস্তা নেই। তখন সে মাথা চুলকুতে আরম্ভ করে দিলে। আমি তাকের উপর থেকে গোটা দুই নারকুলে কুল পেড়ে তার হাতে দিয়ে বললুম—"বলত, বাবা নন্দদুলাল—রেবতী বাবু কি বললেন?"

নন্দদুলাল কুল দুটো এক সঙ্গে মুখে ফেলে দিয়ে বললে—"রেবতী বাবু বললেন তাড়ীর কলসী ভেঙ্গে দিয়ে এলে দুটো করে লেবেনচুস দেবেন।"

বুঝলুম—তাহলে স্বরাজের propaganda work আরম্ভ হয়ে গেছে।

ছেলেগুলোকে বিদায় করে দিয়ে তামাকটা সেজে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে দুটো টান মেরেছি এমন সময় সিদু মণ্ডলের ছেলে স্বয়ং গোপীনাথ দূরে থেকে "পেন্নাম হই, বাবাঠাকুর" বলে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল।

—"কিরে গোপীনাথ, সকাল বেলা, কি মনে করে রে?—"

গোপীনাথ কাছে এসে মেজের উপর উবু হয়ে বসে চুপি চুপি বলতে

আরম্ভ করলে—“এজ্ঞে, বাবা বললে—যা না হয় একবার বাবাঠাকুরের কাছে, ব্যাওরাটা ত কিছু ভাল বুঝছি নে।”

—“কি ব্যাওরা রে?”

—“এজ্ঞে, ঐ যে কলকাতা হোতে গোয়া হেন একটী ছোকরা বাবু এয়েছেন—আঃ কি বলব, বাবাঠাকুর, তানার নাক দিয়ে মুখ দিয়ে যেন ইংরেজীতে খৈ ফুটতে নেগেছে। তা তিনি ত দুদিন থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে কার কত বিঘে জমী আছে, কত ধান হয়; কত পাট হয় তার তল্লাস করতে নেগেচেন। মতলব কিছু বুঝিনে, বাবাঠাকুর। তিনি ত বলচেন—কলকাতার বাবুরা না কি, কি কোম্পানী খুলেচেন; তাতে নাম লেখালে নাকি আর রোড্‌সেস, খাজনা, ট্যাক্‌স দিতে হবে না। গোমস্তা বাবুকে জিজ্ঞেস করতে গেছলাম। গোমস্তা বাবু বলে দিয়েছে—‘ও সব জরিপের লোক, জমি মাপ জোপ করে খাজনা বাড়াবে; ভাল চাস ত মেরে তাড়িয়ে দে।’ তা সব্বাই ত ঠিক করেছে, সাঁঝের বেলা ওনাকে গো-বেড়েন দিয়ে দেবে। তাই বাবা বললে—যা না হয় একবার বাবাঠাকুরকে সত্যি মিথ্যা জিজ্ঞেস করে যায়।”

—আমি দেখলুম, এরই মধ্যে স্বরাজ অনেকখানি এগিয়েছে। তামাকটা আর আমার খাওয়া হলো না। শেষে কি ভদ্রলোকের ছেলে ন'মাসে ভারত উদ্ধার করতে এসে বেঘোরে মারা পড়বে! হুঁকোটা ছেড়ে আস্তে আস্তে গোপীনাথের সঙ্গে তাদের চণ্ডীমণ্ডপে এসে হাজির হলুম। দেখলুম—স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সব আসবাব একেবারে স্তরে স্তরে সাজানো!

একটী চরকা, তিন বাণ্ডিল সুতো, দুখানা খবরের কাগজ, দু প্যাকেট গান্ধীমার্কা সিগারেট, একটী ছোট ষ্টোভ, এক ডজন বাতি, একটী চায়ের কাপ—একখানি তক্তপোষের এক পাশে সাজান রয়েছে, আর শ্রীমান রেবতী মোহন বি, এ একখানি ছোট পকেট বুকে খস খস করে নোট

লিখ্ছেন। বয়সে ২১।২২ আন্দাজ, এখন ভাল গোঁফ উঠে নি, নাকে চসমাটা এমনি ট্যাড়া ভাবে লাগান যে দেখেই মনে হল ইনি ইংলিশে অ-নর। এবং দন্তরুচি কৌমুদী বিকাশ করে বললেন—আমি এসেছি আপনাদের village টা organise করতে। কি জানেন, যা দেখছি তাতে ছেলেদের মধ্যে propaganda খুব successful হবে আশা করচি; তবে চাষাগুলো বড় worthless—এদের মধ্যে কাজ করতে হলে টাকা চাই। আর কি জানেন—গোঁফ দাড়ি নেই বলে আমার কথা লোকে শুনতে চায় না।

আমার প্রাণপুরুষ অন্তরের মধ্যে খিল খিল করে হেসে উঠছিলেন। সে হাসিটা চেপে আমি গম্ভীর ভাবে বললুম—"গোঁফ বা টাকার জন্যে বিশেষ ভাবনা নেই। দুইই কামালে বাড়ে। আপাততঃ সাতটী দিন বক্তৃতাটী একটু বন্ধ রাখুন। স্বরাজ যায় আবার আসে, কিন্তু পৈতৃক প্রাণটা চাষার হাতে গেলে আর ফিরবে না।"

---

(১২)

সংকীর্ত্তনে ভারত-উদ্ধার।

বিশুদা'র ভাইপো গোপাল ছেলেটী বড় ভাল। তবে তার মাথায় এখনো টাক পড়েনি আর হজম শক্তিটাও বেশ সতেজ আছে বলে বিশুদ্ধ ভক্তিতত্বটা সে বরদাস্ত করে উঠতে পারে না। সেদিন সকাল বেলা পণ্ডিতজীর কাছে বসে আছি এমন সময় গোপাল একখানা মাসিক কাগজ হাতে করে এসে উপস্থিত। মুখখানা একটু শুকনো শুকনো। চোখ

দেখলে মনে হয় যেন ভেবে ভেবে রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। তাকে দেখেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"কি গোপাল! সব খপর ভাল ত রে?"

গোপাল সে কথায় কোন উত্তর না দিয়ে বল্‌লে—"বড় মুস্কিলে পড়ে গেছি, দাদা। এই দেখুন না জ্যেঠামশাই আমার কি কীর্ত্তি করে বসেছেন!"—বলেই গোপাল মাসিকখানা খুলে পড়তে আরম্ভ করে দিলে—"জানি বাঙ্গলা দেশ ভাবের দেশ। বাঙ্গলার মাটির ওপরে আজকের এই ভাবের ঢেউ নূতন জিনিষ নয়। ভাব জিনিষটা যতই বড় হোক, আর যতই ভাল হোক, শক্তিহীনের পক্ষে তার ফলটা খুব ভাল হয় না। দুর্ব্বল দেহে যেমন সবল নাড়ী প্রায়ই মারাত্মক, লঘু আধারের পক্ষে গুরু আধেয় যেমন নিরাপদ নয়, অনধিকারীর পক্ষে শক্তিসম্পন্ন বীজ যেমন অনিষ্টকর, লঘু চিত্তে ভাবাবেশ তেমনি অশুভকারী। এমন কি ভগবদ্‌ভক্তির ভাবটা পর্য্যন্ত এ নিয়মের বাইরে নয়। গৌরাঙ্গ ঠাকুরের এমন ভক্তির ধর্ম্ম, জ্ঞানের রজ্জুর দ্বারা সংযত না হওয়ায় বাঙ্গলা দেশের যে অধঃপতন ঘটিয়েছিল তার ফল বাঙ্গালী এখনও হাড়ে হাড়ে ভুগছে। তার পরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গলার-নাট্য-কলায় যে ভাবের আতিশয্য বাঙ্গালীজীবনকে আন্দোলিত করে, তার ফলে সমগ্র বঙ্গ বহুকাল যাত্রা পাঁচালী তরজা আর কবির লড়াইয়ে মত্ত হয়ে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম আর মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিয়েছিল।"

পণ্ডিতজী এই পর্য্যন্ত শুনে বলে উঠ্‌লেন—"কেন, এত বেশ কথা! এতে তোমার আপত্তি কি গোপাল?"

গোপাল একটু হেসে বল্‌লে—"পণ্ডিতজী, এ পর্য্যন্ত না হয় বুঝলুম। গৌরাঙ্গদেবের ধর্ম্মের সঙ্গে তরজা পাঁচালীর সম্বন্ধটা না হয় জ্যেঠা মহাশয়ের খাতিরে স্বীকার করেই নিলুম; কিন্তু সেই ভাবের নেশা ছোটাবার জন্যে জ্যেঠামশাই যে দাওয়াই বাৎলাচ্ছেন, সেটা ত একবার শুনে নিন।"

জ্যেঠামশাই ভাবের নাচানাচি বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েই পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করছেন :—"তিন হাজার পাগলা ছেলে হিসাব বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে ? দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে, ভগবানের জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে নিত্যানন্দের মত প্রেমে পাগল হয়ে ছুটে আসতে পারবে ? * * * পাগলামিতে একেবারে বুঁদ হয়ে থাকতে হবে !"

এই পর্য্যন্ত শুনেই পণ্ডিতজী বলে উঠ্‌লেন—"দাঁড়া, দাদা, দাঁড়া। একটু সম্‌ঝে সম্‌ঝে রস গ্রহণ করতে দে। তত্ত্বকথাটা একটু ঘোলাটে রকমের হয়ে উঠল না ? গৌরাঙ্গ ঠাকুরের ধর্ম্মটা জ্ঞানের রজ্জু দিয়ে সংযত করা হয় নি বলে দেশে যত অঘটন ঘটেছিল তা'র তালিকা ত তুই এই মাত্র শোনালি। এখন নিত্যানন্দের মত প্রেমে পাগল হয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ে, পাগলামিতে বুঁদ মাতাল হয়ে পড়ে থাকলে সে সব দোষ খণ্ডে যাবে না কি ? এতদিন ত জানতুম যে কুকর্ম্মই হোক আর সুকর্ম্মই হোক, গৌর নিতাই যা করেছিলেন, দুজনে মিলেই করেছিলেন, এখন গৌরের প্রেমটুকু বাদ দিয়ে নিতাইএর প্রেমটুকু রাখতে হবে, না কি করতে হবে কিছু ঠাউরে উঠতে পাচ্ছিনে যে ! গৌরাঙ্গের ভক্তিতত্ত্ব থেকে যদি পাঁচালী, তরজা আর কবির লড়াই বেরিয়ে থাকে, তা' হলে এ নবীন নিতাইদের প্রেমতত্ত্ব থেকে যে খেমটা বা খেউড় কেন বার হবে না তা ত বুঝতে পাচ্ছিনে। কই, পড় দেখি আর একটু, ব্যাপারটা মাথায় ঢোকে কি না দেখি।"

গোপাল মাথা চুল্‌কুতে চুল্‌কুতে বল্‌লে—"তাই ত ! জ্যেঠামশাই যে দেশের দুর্ব্বল নাড়ীর জন্য সর্ব্বভাবান্তক প্রেমরসের ব্যবস্থা করলেন সেটা জ্ঞানাগ্নিতে কত পুট পাক করা হয়েছে তা যে দেখতে পাচ্ছিনে। শুনুন দেখি আপনি যদি এ চিকিৎসার মর্ম্ম কিছু বুঝতে পারেন ?

জ্যেঠামশাই বলছেন—"আমি চাই এমন বিশ পঞ্চাশ জন মানুষ যারা ছেঁড়া কাপড় পরে তাঁত বুনবে, প্রয়োজন হলে চাষীদের মত পোষাক পরে মাটী কোপাতে যাদের লজ্জা বোধ থাকবে না, হরি নামের তুফান তুলে যারা পথে ধেয়ে বেড়াবে। আমি চাই এমন মানুষ হরিনামের শক্তিতে যাদের বিশ্বাস আছে, প্রেমের জগজ্জয়ী শক্তিতে যাদের বিশ্বাস আছে। * * * হরিনামের সরস কথায় একদণ্ডে মানুষকে পাগল করে দেওয়া যায়, তা আমাদের অচিরে প্রমাণ করতে হবে। * * * একমাত্র নামের গুণে অসম্ভব সম্ভব হবে, জলে শিলা ভাসবে, আকাশে কুসুম ফুটবে * * * আর ইংরাজ প্রভুর উচ্চাসন থেকে নেমে এসে ভারতের পদে বিলুণ্ঠিত হবে।"

পণ্ডিতজী হেসে বল্‌লেন—"হরিনামের তুফান তুলে রাস্তায় ধেই ধেই করে বেড়াবে আর অবসর মত ছেঁড়া কাপড় পরে তাঁত বুনবে আর চাষ করবে—এ রকম বিশ পঞ্চাশ জন লোক আজকাল মালপো ভোগের ব্যবস্থা করলেই মিলতে পারে। তবে হরিনামের জগজ্জয়ী শক্তিতে তাদের বিশ্বাস আছে কি না তা তোমার জ্যেঠামশাইকে পরীক্ষা করে নিতে হবে। তাঁর মত শুষ্কতরুও যখন এই বয়সে "মুঞ্জরিল" তখন হরিনামের যে খানিকটা মাহাত্ম্য আছে তা স্বীকার করতে হবেই। গৌরাঙ্গদেবের সময় বনের বাঘ ভালুকও নাকি সঙ্কীর্ত্তন শুনে নেচেছিল এই রকম শোনা যায়। কিন্তু পাঠান বাদশারা যে সিংহাসন ছেড়ে গড়িয়ে পড়েছিলেন তার ত কোনও প্রমাণ পাইনে। আর ভাল কথা—হচ্ছিল হরিনাম, তার ভিতর ইংরেজের উচ্চাসন ছাড়াছাড়ির কথা এল কেন হে?"

গোপাল বললে—"আজ্ঞে, ঐটেই ত গোড়ার কথা। জ্যেঠামশাই বলতে চান যে স্বরাজ পেলেই যখন মনুষ্যত্ব লাভ হয় না, তখন স্বরাজ

স্বরাজ ভুলে গিয়ে ইংরাজকে তার প্রাপ্য গণ্ডা খাজনা দিতে থাকো, আর রাজনীতির সকল সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে একটা মনুষ্যত্বের আন্দোলন কর, একটা প্রেমের propagandaর আয়োজনে লেগে যাও।”

পণ্ডিতজী হাঁফ ছেড়ে বলে উঠ্‌লেন—“ও তাই বটে! তা ইংরেজের কি কি প্রাপ্যগণ্ডা তা তোর জ্যেঠা মশায়কে ঠিক করে দিতে বলিস। ঐ প্রাপ্যগণ্ডা ঠিক করতে গিয়েই ত স্বরাজের ফঁ্যাসাদ উঠেছে। আমাদের ছেঁড়া কাপড় পরে তাঁত বুনতে বুনতে হরিনামের তুফান তুলতে দেখলেই যদি ইংরেজ ভক্তির কুয়াশার ঝাপসা দেখে সিংহাসন থেকে গড়িয়ে পড়ে যায়, ত তোর জ্যেঠা মশায়ের টাকের উপর একটা মুকুট পরিয়ে দিয়ে না হয় তাঁকেই সেই সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু জানিস ত দাদা, আমি একটা জাতকাট পাষণ্ড। আমার কেবলি মনে হচ্চে যে শুধু নামের গুণে জলে শিলাও ভাসতে পারে, আকাশে কুসুমও ফুট্‌তে পারে—তবু ঐ কার্য্যটী হবে না। দেখছিস নে তুকারামের সঙ্গে এসেছিলেন রামদাস ও শিবাজী, নানকের পরে এসেছিলেন গুরু গোবিন্দ? আর এবারে কি চরকার সঙ্গে মৃদঙ্গ জুড়ে দিলেই কাজ হাসিল হবে?

---

(১৩)

ত্যাগের ভোগ।

পণ্ডিতজী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—“তোমরা যাই বল, আর যাই কও, ত্যাগের মত ভোগ আর নেই!”

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"সে আবার কি রকম? তুমি হেঁয়ালিতে তত্ত্ব-কথা প্রচার করতে আরম্ভ করলে যে!"

পণ্ডিতজী বললেন—"ত্যাখ, কথাগুলো বেশী সোজা হয়ে গেলেই হেঁয়ালির মত শোনায়; কিন্তু ওর মধ্যে গবেষণা করবার বিশেষ কিছু নেই। আচ্ছা, ঐ যে সে দিন প্রমথ বলে ছেলেটী এসেছিল, দেখেছিস্ ত? খুব ভাল ছেলে—একেবারে university ফাটিয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু আধঘণ্টা তার সঙ্গে কথা কইলেই সে প্রকারান্তরে জানিয়ে দেবে যে, ইচ্ছা করলেই সে একটা কেষ্ট বিষ্টু হতে পারত; আর ইচ্ছা করেই সে তা হয় নি। কথাগুলো বলবার সময় তার টানাটানা চোখ দুটো কেমন ভাবে ঢুলে পড়ে দেখিছিস? তার অন্তরাত্মা যেন একেবারে নিজের সঙ্গে প্রেমে পড়ে নিজেকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে চুমো খেতে যাচ্ছে!"

আমি বললুম—"ভালরে ভাল! নিজের কাজ যদি নিজেকে ভাল লাগে, তাতে ত অন্তরাত্মার তুষ্টি হবেই! এতে তুমি খুঁত ধরবার কি পেলে?"

পণ্ডিত বললেন—"আরে, ঐ ত তোরা গোল করিস! আমি খুঁত ধরি, তোদের কে বললে? আমি শুধু সব জিনিসের স্বরূপ কথন করে যাচ্চি। মানুষ নিজেকে কত রকম করে ভোগ করছে তাই দেখাচ্ছি মাত্র। ঐ যাকে বলিস্ ত্যাগ, সেটাও ভোগের রকমারি। আচ্ছা, সেদিন যখন প্রমথ খদ্দরের শার্ট আর ধুতি পরে দেখা করতে এল, তখন তার চোখ দুটো আহ্লাদে টপ্ টপ্ করে কি রকম নাচছিল দেখিছিস? আমি দিব্যি করে বলতে পারি যে, সে এখানে আসবার আগে আরসির সামনে অন্ততঃ দশ মিনিট দাঁড়িয়ে চুলগুলো একটু উস্কো খুসকো করে দিয়ে দেখেছিল যে মোটা কাপড় আর ঢিলে শার্টে তাকে বেশ মানায়। নিজের রূপ দেখে সে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল! একটা জিনিস লক্ষ্য করিছিস কি না জানিনে, যে সে প্রায়ই বলে যে কোনও

মেয়ের ফাঁদে পড়বার ছেলে সে নয়। কথাটা আমার মনে হয় ভারী সত্যি। নিজেকেই সে এত ভালবেসে ফেলেছে যে আর কোনও ভালবাসার জায়গা তার মনের ভিতর নেই।”

সমালোচনাটা আমার কি রকম কি রকম ঠেক্‌ছিল। আমি বল্‌লুম —“পণ্ডিতজী, তুমি বড় Cynic।”

পণ্ডিতজী হেসে বললেন—“সত্যি কথাকে যদি কাপড় চোপড় পরিয়ে তার পর ভদ্র সমাজে বার হবার অনুমতি দিস, তা হলে অবিশ্যি আমি নাচার। কিন্তু আমার মনে হয় যে, ন্যাংটা সত্যি কথার মধ্যে একটা রস আছে, যা' সব রসের চেয়ে মধুর। আর এতে দোষই বা কি? নিজের মাধুরী মানুষ নিজে ভোগ কর্‌ছে—এ কথাটা শুনে এত বিবর্ণ হয়ে ওঠবার কি আছে? আজ কাল সভ্য সমাজে অনেক ধার্ম্মিক মেম সাহেবদের গলায় একগাছি করে ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মত দানার মালা থাকে দেখেছিস ত? তুই কি বলতে চাস, যে, যে সত্যটা বাইরে ঐ মালার মূর্ত্তি ধরে বুকের উপর দুলছে—সেটা একেবারে ষোল আনাই আধ্যাত্মিক? তার মধ্যে ললিত শিল্পকলার খাদ কি একটুখানিও নেই? মালাটা পরবার আগে মেম সাহেবেরা কি ভাবে না যে, ধর্ম্মের ঐ বিগ্রহটাকে কোথায় কেমন করে দোলালে বেশ মানাবে?”

আমি বললুম—“দেখ, পণ্ডিতজী, দাঁতের সুড়সুড়নি নিবারণের জন্যও ত দেশ, কাল, পাত্র মান্‌তে হয়। নরম মাংস পেলেই যে এক কামড় দিতে হবে, তার ত কোন মানে নাই।”

পণ্ডিতজী বললেন—‘এর ভেতর নরম গরমের কোন কথাই নেই। এই আমায় কথাই ধর না; আমার মাংস যে বেশ নরম, এ কথা একা আমার কলহপ্রিয়া গিন্নি ছাড়া আর বোধ হয় কেউ বলবেন না; আর হাতে গঙ্গাজল লেগে থাকলে তিনিও বলবেন কি না সন্দেহ; আমার কীর্ত্তিটাই

শোন্। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন ছোঁড়ারা হরিসভায় টেনে নিয়ে গেল, তখন বুড়ো হলে হবে কি,—বাঙ্গালীর কোমর কি না—তাই সকলকার দেখাদেখি এক একবার খেলিয়ে খেলিয়ে উঠতে লাগল। 'যা থাকে কপালে'—বলে আমি সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। প্রায় পনের মিনিট লাফিয়ে যখন হাঁপিয়ে উঠেছি, তখন শুনতে পেলুম পাশ থেকে দুটো বুড়ী মাগী বলাবলি কর্‌ছে—'আহা, পণ্ডিত যেন ভাবে ঢলে ঢলে পড়ছে।' আমি যে জন্যে ঢলে পড়ছিলুম, সেটা যে ভাবের চোদ্দপুরুষেরও কেউ নয়, তা বোধ হয় তোমাকে বোঝাবার দরকার নেই। কিন্তু করি কি, যাই ঐ কথাগুলি কাণে যাওয়া, অমনি ধিনিক্ ধিনিক্ করে ফের নাচ সুরু করে দিলুম। এক একবার মনে হতে লাগলো যে দশা লাগাবার কায়দাগুলো যদি আয়ত্ত করে রাখতুম, তা হলে এই সময় ভারী কাজে লেগে যেতো। পাছে হাতে পায়ে চোট লেগে যায়, সেই ভয়ে দশা লাগা আর আমার হয়ে উঠলো না। কিন্তু সেই সময় যদি সাহস করে হাতটা পাটার মায়া ত্যাগ করে একবার আছাড় খেয়ে পড়তে পারতুম, তা হলে কি রকম যে একটা 'ধন্যি ধন্যি' পড়ে যেতো, তা ভেবে এখনো আমার আপশোষ হচ্চে। সুবিধে মত ত্যাগ ধর্ম্ম পালন করতে পারলে, সেটা একদিন না একদিন কাজে লেগে যায়ই।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বক্তৃতা বন্ধ করে দিয়ে নিতান্ত ভাল মানুষের মত পণ্ডিতজী আমার মুখের দিকে একবার চাইলেন। বাঁকা কথা ছাড়া তিনি সোজা কথা বল্‌বেন না বলে প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন। তাঁর গোবেচারীর মত নির্ব্বিকার মুখ দেখলে সর্ব্বাঙ্গ জলে যায়। আমি বল্‌লুম—"পণ্ডিতজী, লোকের দোষ ত্রুটীকে ঠাট্টা কর, সে এক কথা। ত্যাগ ধর্ম্মটাকে অমন খোঁচা মারবার দরকার কি?" পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"ত্যাগ বলে যে একটা ধর্ম্ম আছে, তা ত আমি জানি নে। ত্যাগ কাউকেই

ধরে রাখে না ; আর যা ধরে রাখে না তা ধর্ম্ম হবে কি করে ? ত্যাগের গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে ভগবান সৃষ্টি করে একেবারে ল্যাজে গোবরে হয়ে পড়েছেন, আর এখন সৃষ্টি ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারলেই বাঁচেন—এই না ? আর এই কথাটাই সংস্কৃত করে বল্‌লেই তার নাম হয়ে যায় শাঙ্কর ভাষ্য। কথাটা সত্যি কি মিথ্যে তা নিয়ে টিকি ছেঁড়া-ছিড়ি যতক্ষণ ইচ্ছে করতে পার ; কিন্তু ভগবানকে এতবড় না-মরদ ত আমার কখনই মনে হয় না। ভগবান আর যাই হোন, তিনি গোঁসাইও নন, নির্ব্বাণ-লোভী উদাসীও নন।

---

(১৪)

ধর্ম্মের সোল এজেন্সি।

গোপাল দা আমাদের বেশ দুপয়সা জমিয়েছিল, কিন্তু এবার একটী টাটকা পাশকরা ভাল ছেলে দেখে বড় মেয়েটীর বিয়ে দিতে গিয়ে দেনায় কিছু জড়িয়ে পড়েছে। মেজ মেয়েটীও দশ উতরে এগারয় পড় পড়, সুতরাং শাস্ত্রমতে এক রকম অরক্ষণীয়া বল্‌লেই চলে। গোপালদার মত নিষ্ঠাবান হিন্দু ত আর সেটীর বিয়ে স্থগিত রেখে নিরয়গামী হতে পারেন না। তাই গোপাল দা মহা ভাবিত হয়ে পড়েছেন। আর গোদের উপর বিষ-ফোড়ার জ্বালাটা একবার দেখ! পৌনঃপুনিক দশমিকের মত বৌ-দিদি আমার একটীর পর একটী বংশধর প্রসব করেই চলেছেন। সে সব নেড়ি গেঁড়িগুলি সামলায় কে ? দাদার একটী বেঁটে খেঁটে গোবদা-গাবদা রকমের পিশ-শাশুড়ী অসুখের সময় বৌ-দিদিকে দেখতে এসে

যে আড্ডা গেড়েছেন, তা আজ প্রায় এক বছর হয়ে গেল; নড়বার নামটী নেই। আজ ক্ষুদে মঙ্গলবার, কাল ঘেঁটুই ষষ্ঠী, পরশু তেরস্পর্শ—পোড়া পাঁজীওয়ালারাই কি একটা যাত্রা করবার ভাল দিন রেখেছে? তার উপর পুঁটি, খেঁদি আর গোবরা তাঁর এমনি স্থাওটো যে তিনি চোখের আড় হলেই তারা নাকি সব হেদিয়ে মারা পড়বে। বৌদিদির একটী বিধবা পিস্‌তুতো বোন তারকেশ্বরে জল দিতে এসে বৌদিদির সঙ্গে দেখা করতে আসে। তার পর থেকে তাকে এমনি গেঁটে বাতে ধরেছে যে গোপাল দা যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে ততক্ষণ সে মেয়েটী আর নড়তে চড়তে পারে না! আহা অনাথা মানুষ, কোথাই বা যাবে?

এই ত অবস্থা। কাজেই গোপাল দা'র বৈরাগ্যের মাত্রা যত পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়তে আরম্ভ করেছে, মেজাজটাও সেই অনুপাতে ছড়ছে। বয়সও প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হলো। আর তার উপর আজ খেঁদির জ্বর, কাল পুঁটির পিলে, পরশু পিশ-শাশুড়ীর দ্বাদশীর পারণ—এ সব কি ভাল লাগে? গোপাল দা তাই ক্ষুব্ধ হয়ে তামাক টান্‌তে টান্‌তে বল্‌লেন—"কি বলবো, ভাই, এক একবার মনে হয় যেদিকে দু চক্ষু যায়, বেরিয়ে পড়ি। গয়লা বেটা দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে; মুদী ত এমনি তাগাদা আরম্ভ করেছে যে রাস্তায় বা'র হওয়াই দায়। এখন উপায়?"

পণ্ডিতজী ঘরের কোণে বসে এক মনে চক্ষু বুজে তামাক টানছিলেন। আমি তাঁকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলুম—"হাঁ পণ্ডিতজী, একটা উপায় ত কিছু বাতলে দাও।

পণ্ডিতজী চক্ষু খুলে গোপালের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"আরে বুদ্ধি থাকলে আবার পয়সার ভাবনা? আমি তোমায় আধ ঘণ্টার মধ্যে এক শো আট রকম পন্থা বলে দিতে পারি; তাতে ধর্ম্মও হবে, অর্থও হবে। হাতের কাছে কিছু না পাও গোটা দুই চার স্বপ্নাদ্য মাদুলি বা অব্যর্থ

বটিকা বার করে দাও। একটার নাম রেখে দাও, ভবরোগ কালানল মাদুলি—আর বলে দাও তিব্বত দেশীয় মহাপুরুষ শ্রীমৎ বুজরুকলাল তোমায় স্বপ্নে সেটা দিয়ে গেছেন। রোজ সকাল উঠে সেই মাদুলিটী ধুয়ে একটু করে জল খেলেই তাতে পারা ঘা, নালি ঘা, খোস পাঁচড়ার ঘা, প্রদাহ, চুলকানি, ফুসকুড়ি ফোড়া সাদা সাদা ঘা, চাকা চাকা ঘা, নতুন ঘা, পুরাতন ঘা, মনের ঘা, প্রাণের ঘা, নসীবের ঘা, যত রকম বে-রকমের কণ্ডুমল ও ক্ষত প্রদাহাদি আরোগ্য হয়। আমাদের ঘেয়ো জাতটার বাজারে তা হলে হু হু করে তোমার মাদুলীর কাটতি হবে।

বিনা পরিশ্রমে রাতারাতি কিছু লাভ হয় শুন্‌লে আমাদের দেশের লোকে একেবারে লাফিয়ে উঠবে। তার পর রাস্তার ধূলো, ঘুটের ছাই আর বটের আটা মিশিয়ে একটা মহা-পুরুষত্ব লাভের অব্যর্থ বটিকা টটিকাও করতে পার। আর বিজ্ঞাপন দেবার সময় বলে দিও যে বটিকা সেবনের ফলে লোকে মহাপুরুষ যদি নাও হয় ত পুরুষ নিশ্চয়ই হতে পারবে। এ দেশে পুরুষের চেয়ে মহাপুরুষের সংখ্যা যে রকম বেড়ে চলেছে—তাতে কোনটা যে এখন বেশী দরকার তা বোঝা মুস্কিল।”

গোপাল দা’ একটু বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন—“পণ্ডিতজীর সব কাজেই ঠাট্টা!” পণ্ডিতজী বল্‌লেন—“আচ্ছা দাদা, এ সব ছোট খাট ব্যবসায় তোমার মন না উঠে, ত আমি তোমার পয়সা রোজগারের পাকা রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারি। তাতে একটু বুদ্ধি খরচ করতে হবে বটে, কিন্তু একবার জমিয়ে নিতে পারলে, তিন পুরুষ ধরে বসে খেতে পারবে। ভাল কথা তোমার গুরুজী আসছেন কবে?”

গোপালদা’ বল্‌লেন—“এই বৈশাখী পূর্ণিমার দিন।”

পণ্ডিতজী লাফিয়ে উঠে বললেন ‘বাঃ বাঃ! ঠিক লেগে যাবে এখন। তুমি এখন থেকে রটিয়ে দাও যে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন জগদ্‌গুরু পরমহংস

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীশ্রীনির্ব্বিচারানন্দ স্বামীজী মহারাজ হিমালয়ের গৌরী-শঙ্কর মঠ থেকে পরা-সিদ্ধি লাভ করে জীব-উদ্ধার করবার জন্যে ভারতখণ্ডে নেমে আসছেন। তুমি নিজেও একটু আধটু জটা টটা পাকাতে লেগে যাও। গৈরিকটা রেশমীই রেখে দিতে পার। বললেই চলবে—'ওটা ভোগ মোক্ষের সমন্বয়।' তার পরের কাজটুকুই আসল কাজ। তোমাকে বসতে হবে একেবারে প্রধান চেলা হয়ে। স্বামীজীকে ঘরের ভিতর পুরে একখানা নোটিশ টাঙ্গিয়ে দাও যে তুমিই এই ধর্ম্মের কারবারের আদি ও অকৃত্রিম সোল এজেণ্ট। তোমার সুপারিশ না হলে স্বামীজীর কৃপালাভ অসম্ভব। তারপর বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও :—

(১) খাঁটি নির্ব্বাণ মুক্তি—মায়ার লেশ মাত্র নাই; বড় বড় মঠে গিয়ে পরীক্ষা করাইয়া লইতে পারেন। দশ মিনিটে নির্গুণ ব্রহ্ম দর্শন না হইলে মূল্য ফেরৎ—নগদ মূল্য ১০৲ টাকা; কিস্তিবন্দি করিলে ১২॥০ টাকা।

(২) অকৃত্রিম বৈকুণ্ঠধাম দর্শন—মূল্য ৮৲ আট টাকা। স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের জন্য ৬।০ ছয় টাকা চার আনা।

(৩) ইচ্ছামত দেবদেবী দর্শন—দেবতার তারতম্য অনুসারে তিন হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত।

একবার লাগিয়ে দাও দেখি, দাদা। তারপর টাকা আধুলী আর মোহর এমনি ঝমাঝম্ ঝমাঝম্ করে পড়তে থাকবে যে তোমার পিশ-শাশুরী ধামায় করে কুড়িয়ে শেষ করতে পারবে না।"

গোপাল দা চুপ করে বসে কি ভাবতে লাগলেন।

পণ্ডিতজী বললেন—ভাববার এতে কিছু নেই; চাই শুধু একটু সাহস আর মিথ্যে কথা বলবার কায়দা; তা দু'চার দিন অভ্যাস করলেই আপনি এসে যাবে। আর এটা ত আর কিছু নতুন ব্যাপার নয়। কত

লোক এমনি করে তোফা নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি পাকিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে সোণার গড়গড়ায় তামাক খাচ্চে। এ দুনিয়ার, জানই ত দাদা, শতকরা নিরানব্বই জন লোক একেবারে আস্ত গর্দ্দভ। চক্ষু বুজে ব্রহ্ম দর্শন হলো কি অন্ধকার দর্শন হলো তাই ঠিক করতে পারবে না। আর এক আধটা বেয়াড়া লোক যদি তর্ক তোলে, তা'হলে আমায় কিছু দক্ষিণার ভাগ দিলেই আমি সার্টিফিকেট দিয়ে দেবো যে শ্রীমৎ স্বামীজীর শ্রীচরণ প্রসাদে আমি নির্গুণ ব্রহ্মপুরুষকে হস্তামলকবৎ পেয়ে বসে আছি। বস্, ল্যাঠা চুকে গেল!"

গোপাল দা' মাথা চুলকুতে চুলকুতে উঠে গেলেন। তার তিন দিন পরেই দেখি হ্যাণ্ডবিল ছাপান আরম্ভ হয়ে গেছে।

———

(১৫)

আমার বরাত।

ছেলেবেলা একজন বৈদ্যনাথের ফকির আমার হাত দেখে গুণে বলেছিল—"বাবা, তোমার যে রকম অদৃষ্টের জোর দেখছি, তা রাজবংশে জন্মালে তুমি নিশ্চয় একটা রাজপুত্তুর হতে। হাতে তোমার রাজদণ্ড একেবারে জ্বল্ জ্বল্ করছে।" ভুল করে রাজার ছেলে না হয়ে যখন বাবার ছেলে হয়ে পড়েছি, তখন আর উপায় কি? কিন্তু রাজদণ্ডটা ত আর কেউ কেড়ে নিতে পারচে না!

আহ্লাদের চোটে সে দিন মাসীমার বাক্স থেকে একটা চক্‌চকে সিকি চুরি করে ফকির বাবাজীকে প্রণামী দিয়েছিলাম। তার পর দিন থেকে

লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চুপ করে দেখছি, কবে, কোথা থেকে একটা রাজ্য আর আধখানি রাজকন্যা আমার অদৃষ্টে এসে পড়ে। কিন্তু বামুনে কপাল কিনা—পাথর চাপা।

* * *

সেই পাথর ফুঁড়েও একদিন আঁধার ঘর আলো করে রাজকন্যা এসে পড়লেন। রাজকন্যাই বল্‌তে হবে—কেন না তিনি ভাঙ্গনপুরের রাজার পিসতুতো শালার মাসতুতো বোনের ভাসুর-ঝি! অদৃষ্টটা আধখানা ফলে গেছে দেখে বাকি আধখানার জন্যে ওত পেতে বসে রইলুম। প্রথম যখন ১৯০৬ সালে স্বদেশীর পেটের ভিতর থেকে স্বরাজ উঁকি মারতে লাগল, তখন মনে হলো এইবার বুঝি বেরালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে! তা, শিকে ছিঁড়ল বটে; কিন্তু রাজদণ্ডটা হাতে না এসে, পড়লো একদম ঘাড়ে, আর দিলে আমায় একেবারে ধরাশায়ী করে! কোথায় রইল রাজ্যি, আর কোথায় রইলেন রাজকন্যে!

* * *

আক্কেল যখন ফিরে এল—তখন বেশ বুঝতে পারলুম যে, হয় আমার ক্ষিদে পেয়েছে, নয় মাথা ধরেছে, নয় ভীষণ বৈরাগ্য হয়েছে। ঐ তিনটে জিনিষ এমনি এক রকম যে, আমার চোখে ওদের তফাৎ ধরাই পড়ে না। অনেক বিচার করে স্থির করলুম যে, শাস্ত্রমতে যখন এ রকম অবস্থায় বৈরাগ্য হওয়াই উচিত, তখন নিশ্চয় আমার বৈরাগ্যই হয়েছে। বিশেষতঃ আমার ধাৎটাই এমনি যে ফি বছর অঘ্রাণ মাসে আমার একবার করে বৈরাগ্য হতো; আর শীতকালে কপি. কলাইসুঁটি খাবার পর ভাল হয়ে যেতো। আমি মনে মনে তাই ঠিক করলুম যে, আবু পর্ব্বতের গুহায় গিয়েই হোক, আর নর্ম্মদার তীরে জঙ্গলে গিয়েই হোক, একবার চেপে আসন গেড়ে বসে সেকালের ঋষিদের মত হাজার দশেক

বছর তপস্যা জুড়ে দেওয়া যাবে? কি রকম গভীর ত্যাগ-স্বীকার—তা তারিফ কর!

*　　*　　*

সেকালে রামচন্দ্র যখন কৈকেয়ীর প্যাঁচে পড়ে বনে গিছলেন, তখন অযোধ্যায় চারদিকে এমনি মরাকান্না উঠেছিল যে তার জের এখনো পর্য্যন্ত মরে নি। এখনও আমাদের শশী মণ্ডলের মা সন্ধ্যাবেলা পা ছড়িয়ে রামায়ণ পড়ে আর নাকের জলে চোখের জলে হয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে রামচন্দর এমনই কি বাহাদুরি করেছিলেন? আমি দিব্যি করে বলতে পারি যে সঙ্গে যদি সীতা ঠাকুরুণের মত এক জোড়া শ্রীচরণের নুপূর ধ্বনি রিনিঝিনি বাজতে থাকে, আর লক্ষণের মত ভাই খ্যাটের জোগাড় করে দেয়, তা হলে চৌদ্দ বছর কেন, আমরণ আমি বনে বনে কাটিয়ে দিতে পারি। তোমাদের কলকাতার দিকে ফিরেও চাইনে।

*　　*　　*

তাই ভেবে চিন্তে ঠিক করলুম যে একবার গিয়ে তপস্যায় বসি দ্যুলোক ভুলোক যখন তপস্যার চোটে কেঁপে উঠবে; তখন আর কিছু হোক আর না হোক, তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্যে দেবতারা একটা উর্ব্বশী কি তিলোত্তমা নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন। অন্ততঃ বামুণের কপালে একটা রম্ভা ত জুটবে। তা জুটলো বটে; এক আধটা নয়, একেবারে অষ্টরম্ভা!

মোট কথা হচ্ছে যে, ধুনি জ্বালতে না জ্বালতেই পুলীশে তাড়া করলে। সে কালে তপস্যা করতে বসলে যখন দেবতাদের আসন টলে উঠতো, তখন তাঁরা নানা রকমের ষড়যন্ত্র করতেন বটে, কিন্তু সে সব ষড়যন্ত্রের মধ্যে বেশ একটা মাধুর্য্য ছিল। আর আজকালকার রাজাদের যে æsthetics এঁর জ্ঞান একদম্ নেই, তার প্রমাণ হাতে হাতেই পেলুম।

কোথায় উর্ব্বসী, তিলোত্তমা—আর কোথায় পুলিসের ইন্সপেক্টর; আবার তাও মুখময় গোঁফ দাড়ি। আরে ছ্যাঃ—

* * *

এখন যদি তোমার রামচন্দর আর একবার জন্মে বনে যান, ত সঙ্গে সঙ্গে যদি তাঁকে ১০৯ ধারায় পড়ে তিনটী বচ্ছর চট শেলাই করতে না হয়, ত আমি যা বলি সব মিথ্যে। রাজার ছেলে হয়ে বনে যাওয়া—এ কি ইয়ারকি? নিশ্চয় কোন সিদিশাস কু-মতলব আছে।

যাক সে কথা। কিন্তু নর্ম্মদার তীরে একটী সগুম্ফ তিলোত্তমা আমার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করতেই আমি তপস্যাটা মুলতুবী রেখে সরে পড়েছি। বাইরের রাজ্যির আশা ছেড়ে দিয়ে ঠিক করেছি যে লোকে যেমন এঁড়ে গোরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হয়, আমিও তেমনি বিজলীর চমক ধরে অন্তরের মণিকোঠায় ঢুকে পড়ে নিজের রাজ্যি ফেঁদে দেবো।

---

(১৬)

দেশের ভবিষ্যৎ।

পণ্ডিতজী একটিপ নস্য নিয়ে বললেন—"দেশের কথা? তা শুনতে চাও ত বলতে পারি, কিন্তু বিশ্বাস করবে কি?"

ছেলেটী হাঁ করে পণ্ডিতজীর মুখের দিকে চেয়ে ছিল, একটা ঢোঁক গিলে বললে—"আজ্ঞে হাঁ বিশ্বাস করব বৈ কি; আপনি বলুন না!"

পণ্ডিতজী একটু হেসে বললেন—"দেখো বাপু, আমি বলে খালাস;

ভাল মন্দ জানিনে। তা ছাড়া জানই ত, আমি রোজ সন্ধ্যার সময় একটু করে আফিম খাই।"

ছেলেটী আর কিছু বলবার আগেই পণ্ডিতজী আর এক টিপ নস্য নিয়ে আরম্ভ করে দিলেন :—"সে দিন আষাঢ় মাসের সন্ধ্যাবেলা। সমস্ত দিন ঝুপ ঝুপ করে জল পড়ে রাস্তাঘাট একেবারে ভেসে গেছে। পথে জন প্রাণী নেই। মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ করে বাতাস বইছে, আর থেকে থেকে আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমি জানলা খুলে চুপ করে আকাশের পানে চেয়ে আছি, এমন সময় মনে হলো, সমস্ত পৃথিবীটা যেন কাঁপতে আরম্ভ করেছে। চার দিকে চেয়ে দেখলুম ঘর, দোর, জানলা, বাড়ী কোথাও কিছু নেই, সব কোথায় মিলিয়ে গেছে। আমি আছি—কিন্তু কই, আমার শরীরটাকে ত দেখতে পাচ্ছি নে! ভাবলুম স্বপন দেখছি—কিন্তু না, দিব্যি টন্ টন্ করছে জ্ঞান! মনে হতে লাগলো শূন্যে কোথায় সোঁ সোঁ করে উড়ে চলেছি। সেই মহাশূন্য জুড়ে কেউ নেই—সুধু আমি, আর আমি।"

ছেলেটী জিজ্ঞাসা করলে—"আপনার ভয় করলো না?"

পণ্ডিতজী আর এক টিপ নস্য নিয়ে বললেন—"না ঠিক ভয় নয়, তবে সমস্ত মনটা যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। আর মনে হতে লাগলো, একটা কিছু ঘটবে, কিছু ঘটবে। কতক্ষণ এ রকম ছিলাম তা জানিনে, হঠাৎ একটা কান্নার শব্দ শুনে আমার যেন সমস্ত মনটা কেঁপে উঠলো। এখানে কাঁদে কে? নীচের দিকে চেয়ে দেখলাম—যেন অস্পষ্ট কি একটা দেখা যাচ্চে। কে ও? কান্নার শব্দটা ক্রমে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। মনে হতে লাগলো—কার যেন দেহ, মন সব গলে গিয়ে একটী কান্নার সুর হয়ে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলছে। কে ও কাঁদে?"

ছেলেটী পণ্ডিতজীর কাছে একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—

"তার পর?" পণ্ডিতজী খানিকটা চুপ করে থেকে বললেন—"তার পর? তার পর হঠাৎ সে কান্না চুপ হয়ে গেল। সুমুখে চেয়ে দেখি, মহাশূন্য জুড়ে একটা জ্যোতিঃ ফুটে উঠেছে—আর সেই জ্যোতিঃর মাঝখানে এক দিব্যমূর্ত্তি। আর তাঁর পা থেকে একটা আলোর তরঙ্গ ছুটে গিয়ে পড়েছে পৃথিবীর বক্ষে। সেই আলোতে দেখলাম—যে কাঁদছিল সে কে!"

আমি তখন চুপ করে বসে ছিলাম। পণ্ডিতজীর এই আজগুবী ব্যাপার শুনে জিজ্ঞাসা করলুম—"কে সে?"

পণ্ডিতজী আমার কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—"দেখলুম—একটী মেয়ে মাটীতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। জীর্ণ শীর্ণ আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী কঙ্কালসার দেহ, আর কালো চুলের রাশি কাদায় লুটাচ্চে। তার পিঠের উপর একখানা প্রকাণ্ড পাথর চাপান আর পাথরের ধারে ধারে রক্তের দাগ লেগে রয়েচে। আলোর একটা তরঙ্গ গিয়ে স্নেহাশীর্ব্বাদের মত মেয়েটীর মাথার উপর পড়লো। সারা দেহ তার কেঁপে উঠলো। সে আকাশের পানে মাথা তুলে দেখলে জোতির্ম্ময় পুরুষের মুখ করুণায় ভরে গেছে। তিনি বললেন—ওঠ।

মেয়েটী একবার হাতের উপর ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলে। পাথরের চাপে দেহ তার ফেটে ফেটে রক্তের ধারা ছুটতে লাগল। মুখ তার চোখের জলে ভেসে গেলো। দিব্যপুরুষের পায়ের দিকে একবার কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে সে আবার পড়ে গেলো।"

ছেলেটীর মুখখানি বেদনায় ভরে উঠলো। সে তার চোখ দুটী পণ্ডিতজীর চোখের উপর রেখে জিজ্ঞাসা করলে—"সত্যি?"

পণ্ডিতজী নস্যদানিটা বেশ করে ঠুকে আর একটিপ নস্য খুব জোরে টেনে নিয়ে বললেন—"সত্যি মিথ্যে জানিনে; যা দেখলুম তাই বলছি। সত্যি কি মিথ্যা তা ত চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ। ১৯০৭এ

দেখেছ, ১৯২১'ও দেখছো। পাঁচ সাত বছর বেঁচে থাকলে বাকিটাও দেখবে।"

হেঁয়ালিটা যেন একটু স্পষ্ট হয়ে এল। ছেলেটী অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"বাকিটা কি দেখলেন?"

পণ্ডিতজী একটু চুপ করে থেকে বললেন—'যা দেখলুম, তা আফিম-খুরির বাড়া। ভগবান কখনো কাঁদে বলে মনে হয়?—হয় না? কিন্তু আমি সেই দিন ভগবানকে কাঁদতে দেখেছি। বেশ স্পষ্ট দেখেছি—সেই মেয়েটীর জন্যে ভগবানের চক্ষু ফেটে জল পড়লো। তিনি বললেন—"ওঠো, আমি যে তোমায় চাই।"

মেয়েটী চুপ করে পড়ে রইলো। বললে—"আমার শক্তি ফুরিয়ে গেছে; তোমার শক্তিতে আমায় তুলে নাও! আমার দেহ, মন, প্রাণ যদি বেঁচে ওঠে, ত তোমার শক্তিতে বেঁচে উঠুক।"

ভগবানের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম হাসিতে মুখ ভরে উঠেছে। হায় রে কাঙ্গাল ভগবান! তুমি এই কথাটী শোনবার জন্যে এই হাজার বৎসর বসেছিলে?

তার পর? তার পর সেই জ্যোতির তরঙ্গে গা ভাসিয়ে ভগবান নেমে এলেন। মেয়েটীর হাত ধরে বললেন—"এইবার ওঠ, তোমার বাঁধন খসে গেছে।"

* * *

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'হাঁ পণ্ডিতজী, এটা কি খেয়াল?' পণ্ডিতজী বললেন—"কি জানি দাদা, আমিও তাই ভাবি। একবার মনে হয়—'এও কখন হয়'? আবার মনে হয়—"দেবতার লীলা; হবেও বা!"

(১৭)

রকমারি স্বরাজ।

সেদিন পণ্ডিতজীর ঘরে ঢুকে দেখি যে তাঁর অমন তালগোল পাকান মুখখানি যেন বেগুণ পোড়ার মত হয়ে গেছে—চক্ষু রক্তবর্ণ, দন্ত একেবারে নাসিকাবর্ণ! আমাকে দেখেই তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"ত্মাখ, হপ্তায় হপ্তায় যদি এক একবার নিয়ম করে দাঁত খিচুনো যায়, তা হলে দু একটা দাঁত খিচুনি বন্ধু বান্ধবদের গায়ে লাগবেই। সত্যি সত্যি ত আর ফি-বার রাস্তার লোক ধরে তাদের কাছে দাঁতের আর জিহ্বার কসরৎ দেখান চলে না! কিন্তু বন্ধু বান্ধবদের তাতে ঘোরতর আপত্তি। যিনি কাস্তে ভেঙ্গে কর্ত্তাল গড়িয়ে ছিলেন তিনিও চোটে গেছেন, আর যিনি——"

কথাটা আর শেষ হলো না। দরজার কাছে গোপালদা'র গোঁফ জোড়া দেখা দিতেই পণ্ডিতজী বলে উঠ্লেন—Talk of the devil and he is sure to come, এই যে গোপাল দা, কি খবর?"

গোপাল দা' বললেন—"আর খবর! সে দিন গোল দীঘিতে বক্তৃতা শুনে এসেছিলুম যে ঘরে ঘরে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করতে হবে; তাই একবার নিজের ঘরে চেষ্টা করে দেখছিলুম। তা খদ্দরের নমুনা দেখেই গিন্নি তাঁর তিলফুলজিনি নাসাটীকে ৪৫ ডিগ্রী উঁচু করে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি যেখানে বিরাজ করছেন তার দশক্রোশের মধ্যে স্বরাজকে ঘেঁসতে হবে না। তিনি যে ঘরের গিন্নি সে ঘরের কোণে পক্ষীরাজের ডিম ফুটলেও ফুটতে পারে, কিন্তু স্বরাজের ডিম ফোটবার কোন সম্ভাবনা নেই। কাজে কাজেই আর করি কি! 'দেবী আমার, সাধনা আমার'—বলে তাঁকে দূর থেকে আলিঙ্গন জানিয়ে সরে পড়লুম।"

কথাগুলো শুনেই পণ্ডিতজীর বেগুণ পোড়ার মত মুখখানিতে কে যেন লঙ্কাবাটা ছড়িয়ে দিলে। তিনি তাঁর চোখ দুটী পাকিয়ে একবার রাইট টার্ণ একবার লেফ্‌ট টার্ণ করে নিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন—"ও ত জানা কথা। ঘরটা বাঙ্গালীর পররাষ্ট্র ; সেখানে স্বরাজ ফাঁদবার উপায় নেই। স্বরাজ গড়তে চাও, ত চলে যাও একদম গোলদিঘীর পাড়ে, আর গরীবের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে মোটর চড়ে বেড়াও, নয় ঢুকে পড় বিজলী সম্পাদকের মত অন্তরের মণিকোটায়। পরের অন্তরে খোঁটা গাড়তে গেলে যখন তাদের আপত্তি, তখন স্বরাজের খোঁটা নিজের অন্তরে গাড়া ছাড়া আর উপায় কি ? কিন্তু এক এক জনের প্রাণের মধ্যে এক এক রকম স্বরাজের হুমোপাখী যে ডিম পাড়ছে, তার করছ কি ?"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"তাতে এত দোষটাই বা কি ?' পণ্ডিতজী বললেন—"আরে বাপু, এই অন্তরের স্বরাজ ত এক দিন না এক দিন ঘোমটা খুলে বাইরে বা'র হবে ? তখন কার স্বরাজ খাঁটি তাই নিয়ে গোলমাল লাগবে না ? দেবভূমি ভারতের এই তেত্রিশ কোটী (অপ) দেবতারা সবাই নিজের নিজের অন্তরে যদি এক একটী স্বরাজ গড়ে ফেলেন তখন এই তেত্রিশ কোটী স্বরাজের ঠোকাঠুকিতে একটী স্বরাজও টিঁকবে কি না সন্দেহ। শেষে খুচরো খুচরো স্বরাজের ঠেলা সামলাবার জন্যে রুশিয়া থেকে শ্ব-রাজ না আমদানি করতে হয় ! কে কার কাছে ঘাড় নোয়াবে বল,—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কেউ ত কারু চেয়ে কম নয় ! আমরা এক একটি নোড়া নই, এক একটী শালগ্রাম !

আমি মাথা চুলকুতে চুলকুতে বল্লুম—"তা, পণ্ডিতজী গোড়ায় অমন একটু আধটু গলদ হয়েই থাকে। দেশটা যখন নিজেদের হাতে এসে পড়বে, তখন বাকি সবটা ঠিক ঠিক গড়ে নেওয়া যাবে।"

পণ্ডিতজী একটু হেসে বল্লেন—"অর্থাৎ আগে রাজটা গড়ে নেওয়া

যাক, তার পর 'স্ব'টা তার সঙ্গে জুড়ে দিলেই চলবে: এই না? খুব বুদ্ধিমানের কথা; কিন্তু গড়ে কে? কেউ কলম, কেউ মৃদঙ্গ, কেউ লাঠি, আর কেউ তেলের বাটী নিয়ে হাজির হয়েছেন। কার অন্তরে যে কি রকম রাজটী আছে তা ত বোঝবার জো নেই। সবাই বলছে—'খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি।' বক্তৃতা হাওয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্চে; আর 'স্ব' টাকে খুঁজে না পেলে কোন রাজই গড়ছে না।"

গোপাল দা ঘাড় নেড়ে বললেন—"অত গভীর তত্ত্ব বুঝিনে; তবে এটা ঠিক যে দেশের সবাই এখন নিজের নিজের স্বার্থ বুঝতে পেরেছে। তা থেকেই একটা কিছু গড়ে উঠতে পারে; কেন না সেইটাই তাদের 'স্ব'।"

পণ্ডিতজী ম্লান হেসে বললেন—"অত বুদ্ধি না হলে আর আমাদের পোড়া কপাল পুড়বে কেন? আচ্ছা, দেখ দেখি এই তেত্রিশ কোটী দেবতাদের 'স্ব' টা কোন খানে? জমিদার দেবতা ভূঁড়িতে হাত বুলুতে বুলুতে বলছেন তাঁর 'স্ব' ঐ লাটের কিস্তিতে; রায়ত আর পাঁজরার উপর হাত দিয়ে বলছে "আমার 'স্ব' পেটের জ্বালায়"। কলওয়ালা বলছেন—'বাৎসরিক ডিভিডেণ্ডে; মজুর বলছে—'হপ্তায় সাতসিকায়'। গোঁফেশ্বর বাবু বলছেন—'স্ব আছে এক কোটী টাকায়'; লাট সিঙ্গি বলছেন—'খোলা ভাঁটিতে'। হিন্দু বলছেন—বর্ণাশ্রমে, মুসলমান বলছেন—খেলাফতে। এত গুলো 'স্ব' নিয়ে একটা রাজ গড়া মুস্কিলের কথা বটে।

আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"তা হলে উপায়?"

পণ্ডিতজী বললেন—'উপায় নিরুপায়ের উপায়। জানই ত—"It is the unexpected that always happens," বিশ্বাস না হয় খবরের কাগজে একখানা বিজ্ঞাপন লটকে দাও। বলো—

"হারিয়ে গেছে ; আমাদের স্বরাজ গড়বার স্ব টুকু। কেউ বলছেন, ওটা এদেশে কখনো ছিল না, বিলেত থেকে আমদানি করতে হবে ; কেউ বলচেন ভট্‌চায্যি মশায় মাদুলিতে পুরে বর্ণাশ্রমের বাক্সতে বন্ধ করে চাবি হারিয়ে ফেলেচেন। মোট কথা, কোথায় যে জিনিষটা আছে তা কারও বুদ্ধির ভাণ্ডার খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না। খুঁজে যে পাবে—চুপি চুপি আমায় জানিও। সারা দেশটাকে তার পায়ে লুটিয়ে দেব।"

---

(১৮)

গোপাল দা'র বুজরুকি।

প্রায় মাস দুই হলো গোপাল দা'র আর কোন খপর টপর পাওয়া যায় নি। তাঁর গুরুজী যখন এসেছিলেন তখন দিন কতক ছেলেদের মুখে অনেক রকম গুজব শোনা গিয়েছিল। গুরুজী নাকি দিনে রাতে কিছুই একেবারে খান না। রাত দুপুরে আসন করে বসে মাটী ছেড়ে সাড়ে তিন হাত উপরে উঠে পড়েন! মা কালী নাকি অমাবস্তার রাতে তাঁর কাঁধে ভর করলে তিনি খল্ খল করে হাসেন, আর কিড়মিড় করে দন্ত বিচ্ছেদ করেন। আর নাকি তিনি বলেছেন যে যাবার সময় তিনি গোপাল দা'কে সব সিদ্ধাই দিয়ে যাবেন। কথাগুলো শুনেই বুঝেছিলুম যে গোপাল দা' এইবার একটা কেষ্ট বিষ্ণু হয়ে দাঁড়াবে।

সেদিন সকালবেলা আর কিছু কাজ ছিল না বলে পণ্ডিতজীকে বল্লুম—"চল না, একবার গোপাল দা'র খপরটা নিয়ে আসি।' পণ্ডিতজী চাদর খানা কাঁধে ফেলে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন "চল, অনেক কীর্ত্তিই এ

বয়সে দেখা গেল; গোপালের কীর্ত্তিটাও দেখা যাক। গোপাল যে রকম উৎসাহী পুরুষ, তাতে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে একটা ছোট খাট মহাপুরুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, টিকে থাকতে পারলে কালে একটা অবতার হয়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। দেখা যাক, যদি গোপালের কৃপায় স্বর্গে একটা berth reserve করে রাখা যায়।"

গোপাল দা'র বাড়ী পৌছতে না পৌছতেই তিনটি ছেলে এসে সমস্বরে আমাদের খপর দিলে যে গুরুজী এখন ধ্যানে বসেছেন। 'গুরুজী চলে গেছেন না?' জিজ্ঞাসা করতেই পণ্ডিতজী আমার গা টিপে দিয়ে বললেন—"চুপ! বুঝছো না তোমার গোপাল দা'ই এখন গুরুজী হয়ে উঠেছেন?" গোপাল দা'র গুরুজীত্ব প্রাপ্তি শুনে আমি বোধ হয় একটু বেশী রকম হাঁ করে ফেলেছিলুম; আর ছেলেরা আমার দিকে যে রকম করে চাইলে তাতে একটা বেশ বুঝতে পারলুম যে তাদের কোমল প্রাণে না জেনে শুনে কোথায় একটু ব্যাথা দিয়ে ফেলেচি। চুপ চাপ করে বৈঠক খানায় প্রায় আধ ঘণ্টাটাক বসে আছি এমন সময় একটি ছেলে অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এসে আস্তে আস্তে সংবাদ দিলে—"মহারাজ আসছেন! মহারাজ আসছেন!" অনেকগুলি ছেলে সেখানে বসেছিল, তারা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে বললে—"গুরু মহারাজ কি জয়", আর পাশের একটা দরজা খুলে অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে প্রবেশ করলেন—কে বল দেখি? আমাদের শ্রীমান্ গোপাল দা'।

এই দু'মাসের মধ্যেই গোপাল দা'র চেহারা ফিরে গেছে। দিব্য সুঠাম, নধর চেহারা; পরণে গেরুয়া—অথচ পরিপাটী লম্বা কোঁচা ঝুলছে। গায়ে গেরুয়া রঙ্গের পাতলা আলখেল্লা আর মাথায় বাবরী। একেবারে সত্ত্বের মুর্ত্তরূপ! গলায় রুদ্রাক্ষের মালাগাছটীতে একটা চক্‌চকে মহত্ত্ব ফুটে

বেরুচ্চে। আর সবচেয়ে দেখবার জিনিষ দাদার সেই ত্যাগের নধর, নেয়াপাতি বর্ত্তুল ভূঁড়িটি! দেখে আমার সত্যি সত্যিই ঈর্ষা হলো।

পায়ের ধূলো কাড়াকাড়িটা শেষ হয়ে গেলে গোপাল দা' একটী যাত্রার দলের বলরাম গোছের ছেলেকে কি একটা ইঙ্গিত করে দিলেন আর খানিক পরে স্তরে ২ রেকাবীতে সাজান চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় যে সমস্ত জিনিষ এসে হাজির হলো, তা দেখে আমার কপালের জ্ঞান-নেত্রটা একেবারে ফট্ করে ফুটে উঠলো। বড় বড় সাধুদের যে ভূঁড়ি দেখতে পাওয়া যায়, সেটা যে শুধু আধ্যাত্মিক রসে ভরা নয়—তাতে গব্য রসের খাদও যে যথেষ্ট আছে তা আর বুঝতে বাকি রইল না।

ভক্তিতে আমার প্রাণটা একেবারে গলে থস্থসে হয়ে উঠলো। আমি গোপাল দা'র পায়ের কাছে টিপ করে একটী প্রণাম করে বললুম—"দাদা, আজ থেকে আমায়ও তোমার দলে ভর্ত্তি করে নাও। তোমার পায়ে আজ থেকে আমি একেবারে ষোল আনা আত্মসমর্পণ করে দিলুম।"

আনন্দে গোপাল দা'র আধ-বোজা চক্ষু দুটী আরও একটু বুজে এল। তিনি ঈষৎ মাথা নেড়ে বললেন—'তোমার হবে।'

উৎসাহে আমি লাফিয়ে উঠে বললুম—"হবে বৈকি দাদা—থুড়ি গুরুজী! চোখের সামনে দেখতে পাচ্চি ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে কত নড়েভোলা লাট হয়ে গেল; আর আমরা সবাই মিলে যদি উঠে পড়ে লেগে যাই তা' হলে বছর কতকের মধ্যে তোমায় একটা জগদ্গুরু কি অবতার করে তুলতে নিশ্চয় পারবো। তখন আসিষ্ট্যান্ট অবতারের পোষ্টটা আমারই প্রাপ্য। ঢাক পিটিয়ে, ডিগবাজী খেয়ে, মুর্চ্ছো গিয়ে কোন রকম করে আমরা আসর জমকে নেবই নেব। আর আপাততঃ আমাকে হেড-চেলা করে নিয়ে যদি শতকরা পঁচিশ টাকা

কমিসন দেও, তা'হলে আমি retired স্বদেশ-সেবক দলের ছেলেদের মাঝ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তোমার চেলা জুটিয়ে দেব।"

গোপাল দা'র ধ্যান-স্তিমিত চক্ষু একেবারে হাঁ করে চেয়ে উঠলো। দাদার বাচ্ছা বাচ্ছা চেলাগুলির ঢুলু ঢুলু চক্ষু ভেদ করে যে রকম দৃষ্টি বা'র হতে লাগলো সেগুলি ঠিক সাত্বিক বলে ভুল করা মুস্কিল। এমন কি পণ্ডিতজী পর্য্যন্ত ফিক্ করে একটু হেসে ফেললেন।

আমার উৎসাহের এ রকম অমর্য্যাদা দেখে আমি আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলুম। গোপাল দা'র ঠ্যাং দুটো জাপটে ধরে বললুম ;—"আমার গতি কর্‌তেই হবে। তোমার এ সুগম-মার্গ থেকে আমায় বঞ্চিত করলে চলবে না। তা' হলে আমি মনের দুঃখে গলায় রসগোল্লা গুঁজে দম আটকে মরে যাব! আর যে অবুঝ প্রাণীটীকে অগ্নি, দেবতা, ব্রাহ্মণ সাক্ষী করে বিশিষ্ট রূপে বহন করে নিয়ে বেড়াচ্চি তিনিও সেই রসগোল্লার রসে ডুবে আত্মঘাতিনী হবেন। চিরদিন আমি ক্ষুধাপিড়ীত, পত্নী-তাড়িত ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরতে ২ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছি। আমার বাড়ী গিয়ে দেখ, চালের হাঁড়িতে ইঁদুরে দু বেলা এন্‌তার ডন্ ফেলছে। কোন ডেপুটীর সঙ্গে আমার এমন কোন একটা বিশেষ মধুর সম্বন্ধ নেই যে, ইহকালের বন্দোবস্তটা করে নিতে পারি।

ইঁদুরের ডন্ ফেলার বহর দেখে গোপাল দা'র তুরীয় লোকে লীনপ্রায় মন একেবারে মূলাধারে নেমে এলো। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। কাজে কাজেই সে দিনের মত সভা ভঙ্গ করে আমিও পণ্ডিতজীর সঙ্গে বাড়ী ফিরলুম। রাস্তায় পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি এত থিয়েটারী ঢঙ্ কোথায় শিখলে হে? আমি বললুম —গোপাল দা' যখন আমাদের Dramatic Clubএর ম্যানেজার ছিল, তখন যে আমি তার সাক্‌রেদী করেছি।"

(১৯)

অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ।

সে দিন সঙ্কীর্ত্তনের সময় পণ্ডিতজীকে নাচতে দেখে মালপো-তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার সম্পাদক তাঁকে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন আর অনুরোধ করেছেন যে অষ্ট-সাত্ত্বিক লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁকে একদিন বক্তৃতা করতেই হবে।

"এই সামলাও এখন ঠেলা"—বলে পণ্ডিতজী আমার দিকে চিঠিখানা ফেলে দিলেন; "সে দিনকার সঙ্কীর্ত্তনের জ্বালায় এখনও কোমরে মালিশ করতে হচ্ছে; আর তার উপর আজ যদি অষ্ট সাত্ত্বিক খেঁচুনির কসরৎ দেখাতে হয়, তা হলে সন্ধ্যাবেলা দম্ আটকে গিয়ে রাত নটা আন্দাজ বৈকুণ্ঠে পৌঁছে যাবো। না বাবু, ও সব বৈকুণ্ঠে ফৈকুণ্ঠে আমার পোষাবে না। অমনি কেউ মালপো দেয়, ত খবর দিও।"

আমি জিজ্ঞসা করলুম—"তোমার মধ্যে বৈকুণ্ঠে যাবার লক্ষণ বিশেষ ত কিছু দেখছি নে।"

পণ্ডিতজী আশ্চর্য্য হয়ে চোখ দুটো কপালের মাঝখানে তুলে বললেন "বল কি হে! তুমি ত শাস্তর মান না দেখছি! একে আজ লক্ষ্মীবার, তার উপর যদি গলায় মালপো আটকে গিয়ে অষ্ট-সাত্ত্বিক খেঁচুনি খেঁচতে খেঁচতে দেহত্যাগ হয়, তা হলে বিষ্ণুদূতেরা ছেড়ে দেবে মনে করেছ? হরি-ভক্তি-বিলাসের মালপোখণ্ড খানা একবার পড়ে দেখো দেখি!"

"তা, বৈকুণ্ঠে যেতে তোমার এত আপত্তিই বা কেন?"

পণ্ডিতজী বললেন—"বাঃ! প্রথমেই ত বৈকুণ্ঠে ঢুকতে না ঢুকতে চতুর্ভূজ হয়ে যেতে হবে। দুটো হাতের খাটুনিই খেটে উঠতে পারিনে, তা আবার চারটে হাত! আর ভগবান যে সিংহাসনে বসে আছেন, তার

চার দিকে পার্ষদেরা যে ধূপ, ধূনো, গুগগুলের ধোঁয়া দিয়ে রেখেছেন তা চোখে লাগলেই ত অন্ধকার। তার উপর রাত নেই, দিন নেই, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশর, আরতি লেগেই আছে। বড় বড় ভুঁড়েল ভক্তেরা চারদিকে চামর দোলাচ্ছে, আর ঐ নারদ বাপজীবন কেবল সংস্কৃত শোলোক আউড়ে আউড়ে ঘুরচেন। দৈত্য কুলের প্রহ্লাদ থেকে আরম্ভ করে হনুমান দাস বাবাজী পর্য্যন্ত যত সব ভক্তেরা মরে বৈকুণ্ঠে গেছেন, সবাই হয় হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্তবস্তুতি পাঠ করছেন, নয় ত লম্বা হয়ে পড়ে পড়ে নাক রগড়াচ্ছেন। বাপ! আর আমার বৈকুণ্ঠে পার্ষদ হয়ে কাজ নেই। ঘণ্টা কতক ঐ রকম হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে হলেই, হয় আমার নারদের দাড়ী ধরে টান মারবার প্রবৃত্তি হবে, নয় ত গড়ুরের নাকটা ধরে আরও ইঞ্চি কতক লম্বা করে দেবার ইচ্ছে হবে।

"তাই ত; পণ্ডিতজী, বৈকুণ্ঠের এমন হুবহু নক্সা পেলে কোথা থেকে?"

পণ্ডিতজী হেসে বললেন,—"দাদা, তোমরা থিসুকেলি সোসাইটীর লোক, আর এই খপরটা রাখ না। একবারে লেডবিটারের বইগুলো হাতড়ে দেখো দেখি, ভুতলোক, প্রেতলোক থেকে আরম্ভ করে গোলক, ঢোলক এমন কি নোলোক পর্য্যন্ত সব রাজ্যের খবর সেখানে পাবে। ইন্দ্রের উচ্চৈশ্রবা কোন্ লোকে কোন্ খোঁটায় বাঁধা আছে, ঐরাবত কি রকম চিন্ময় খোল বিচালি খায়—তার ফটো পর্য্যন্ত দেখতে পাবে। বাগবাজারের আড্ডার বাইরে অত খবর আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, কর্ম্মমার্গ, এ সব ত অনেক দিনের জিনিষ, কিন্তু ধূমমার্গ এঁদের একেবারে নিজস্ব আবিষ্কার। দেড় ছটাক বৌদ্ধধর্ম্ম, আধ ছটাক বেদান্ত, এক ছটাক বুজরুকি আর এক ছটাক গঞ্জিকা, বেশ করে এক সঙ্গে সিদ্ধ করে এঁরা ভবরোগের পাঁচন যা বানিয়েছেন—তা তারিফ করবার জিনিষ বটে!"

সমালোচনাটা ক্রমে সভ্য রুচি বিরুদ্ধ হয়ে যাচ্চে দেখে আমি বললুম —"চুলোয় যাক তোমার থিসুকেলি সভা। তোমার ভাব গতিক যে রকম দেখছি তা' হলে তুমি অষ্ট-সাত্ত্বিক লক্ষণের বক্তৃতা দিতে যাচ্চ না?"

পণ্ডিতজী বল্লেন—"দরকার হলে আমি আটটা কেন, চৌষটি রকম সাত্ত্বিক লক্ষণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে দিতে পারি—কেন না, বাবাজীদের আধ্যাত্মিক সাত্ত্বিকতার পর, পদী পিসির গার্হস্থ্য সাত্ত্বিকতা, অন্তঃপুরের পিঁজরাপুলী সাত্ত্বিকতা. উপবাসের সাত্ত্বিকতা, রাজনীতিক নৈষ্কর্ম্মের সাত্ত্বিকতা প্রভৃতি নূতন নূতন জিনিষ গজিয়েছে। তবে কোমরের ব্যথাটা ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে দুহাত নেড়ে বক্তৃতা দেওয়ায় অপারগ—দাদা, অপারগ।

---

(২০)

পাঠান রাজত্ব।

সকাল বেলা দাওয়ায় থেলো হুঁকোটী হাতে করে বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিচ্চি এমন সময় পিছন থেকে একটা আওয়াজ এল— "দাদাঠাকুর!" আওয়াজটা যে আমাদের গোপীনাথ ওরফে গুপে বাগদীর ভাঙ্গা কাঁশরের মত গলা থেকে বেরিয়েছে তা পিছন না ফিরেও বুঝতে বাকি রইল না। আর কুণ্ডলী পাকান ধোঁয়াটুকু আমার আজ্ঞাচক্র ভেদ করে সহস্রারে ওঠবার সময় মগজের মধ্যে যে রঙ বে-রঙের অধ্যাত্মিক কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করছিল তাতে বাধা দেবার প্রবৃত্তিও আমার ছিল

না। তাই পিছন না ফিরেই জিজ্ঞাসা করলুম—"কেও, গোপীনাথ যে! কি খবর?"

গোপীনাথ আস্তে আস্তে সুমুখে এসে গলাটা নীচু করে আমার কাণের প্রায় হাত খানেকের মধ্যে মুখ নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—"হাঁ, দাদাঠাকুর সত্যি নাকি? কাবুলের আমীর নাকি দিল্লী দখল করতে আসছে?"

—"আরে বাঃ, এই যে! খবরটা তোর কাছেও এসে পৌছেচে দেখছি! কে বল্লে রে, গোপীনাথ?"

"এঁজ্ঞে ও পাড়ার বছিরুদ্দি মোড়ল ফুরফুরেতে তাদের পীর সাহেবের দরগায় গিয়েছিল, সেই শুনে এসেছে।"

ক'দিন ধরে খবরের কাগজে ঐ কথা নিয়েই তাল ঠোকাঠুকি দেখতে পাচ্ছি। এতদিন ও ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করবার ভার মেসের ছেলেদের আর দেশের নেতাদের উপর দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলুম। আজ গোপীনাথকে তা' নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে রঙীন আধ্যাত্মিক রাজ্য সৃষ্টি করবার আরাম ছেড়ে উঠে বসতে হলো। তাই ত! শেষে সত্যি সত্যি আর একবার কাবুলী কোঁৎকা অদৃষ্টে আছে না কি?

পাশের ঘরে পণ্ডিতজী চিৎ হয়ে চক্ষু বুজে একখানা খবরের কাগজ পড়বার ভান করছিলেন। আমি সেখানে উঠে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"বলি, ও পণ্ডিতজী, দিব্যি চক্ষু বুজে আরামে পড়ে থাকা হচ্ছে, এ দিকে আফগান যে এল বলে!"

পণ্ডিতজী একটা হাই তুলে বল্লেন—"আঃ বাঁচি তা হলে! চীৎ হয়ে পড়ে পড়ে কোমরে পিঠে বাত ধরে গেছে। কাবুলি দাওয়াই ছাড়া এ বাত যে সারবে বলে ত মনে হয় না।"

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লুম—"না, না হাসির কথা নয় যেখানে এতখানি

ধূম, সেখানে কিছু না কিছু অগ্নি আছে নিশ্চয়ই। সত্যি সত্যিই যদি আফগানেরা হুমকি দিয়ে এসে দাঁড়ায়—তখন কি হবে?”

পণ্ডিতজী হেসে বললেন—“আরে, হবে আর কি অশ্বডিম্ব ; খুব জোর আর দুই একখানা “পদ্মিনী” নাটক লেখা হবে। আর দেশের যে সব বাবুভায়ারা চোথা চোথা ইংরিজী ইডিয়ম ভেঁজে ইংরেজের কাছ থেকে ‘ডমিনিয়ন সেলফ গবর্ণমেণ্ট’ ভোগা দিয়ে মেরে দেবার চেষ্টায় ফিরছেন, আমীর সাহেব দিল্লীতে ঢুকতে না ঢুকতেই তাঁরা বড় বড় মৌলবীদের ধরে তোফা একখানি ফার্সি দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়ে দিল্লীর দরজায় গিয়ে ধরণা দেবেন। পাঠান হোসেন সার আমলে বাংলা সাহিত্যের কি রকম উন্নতি হয়েছিল, পাঠান সের সার আমলে দেশে প্রথমে কি রকম ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি হয়েছিল, এই রকম অনেক ঐতিহাসিক গবেষণা সে অভিনন্দন পত্রকে অলঙ্কৃত করবে ; ছেলেরা এ, বি, সি, ডি, ছেড়ে দুলে দুলে আলেফ, বে, পে, তে শিখতে আরম্ভ করবে, যাঁরা এখন মিনিষ্টার হয়ে পড়েছেন তাঁরা উজীর হয়ে দাঁড়াবেন, আর দেশময় বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে বেড়াবেন যে, পাঠান রাজত্বের মত রাজত্ব কখন হয়নি, হবে না! গ্রীষ্মকালে তাঁরা দারজিলিঙ্গে বেড়াতে না গিয়ে কাবুলে বেড়াতে যাবেন, আর রকম বেরকমের মেওয়া খেয়ে লাল হয়ে ফিরবেন। পাঠান রাজত্বের নামে এত ভয় পাবার কি আছে? পরের বাপকে বাপ বলা যাদের অভ্যাস আছে তাদের কাছে ইংরেজই বা কি, পাঠানই বা কি!”

পণ্ডিতজী জিনিষটাকে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন দেখে আমার রাগ ধরে গেল। আমি বললুম—“আরে ছাই, দেশশুদ্ধ ত আর মডারেট নয় যে নিজের নিজের পুঁটলি বাঁধতে ছুটবে! পাঠান এলে দেশে শান্তিরক্ষা করবে কে?

পণ্ডিতজী নিতান্ত ভালমানুষটীর মত মুখখানি করে বললেন—“হাঁ,

ওটা ভাববার কথা বটে। পাঠানেরা ইংরেজের মত অতটা শান্তিরক্ষা করতে পারবে কিনা সন্দেহ। এত মেশিন গান ওরা পাবে কোথা? দেখ দেখি ডায়ার কেমন সোণার চাঁদ—পাঁচমিনিটে হাজার খানেক লোককে একবারে শান্ত করে ছেড়ে দিলে! পাঠানেরা জংলী কি না; শান্তিরক্ষার এত কায়দা শিখবে কোথা? যতদূর দেখতে পাচ্ছি, লোকে এখন দিব্যি শান্তিতে মরছে, তখন মহা অশান্তিতে বেঁচে থাকবে। আর হয় ত অনেক দিন ধরেই লোককে বেঁচে থাকতে হবে। কেন না পাঠান যতই পেট ভরে খাক, ছাঁদা বেঁধে Home charge বাড়ী নিয়ে যাবে না। দেশময় যে এতগুলো কলকারখানা বসেছে তাদেরও হয়ত শতকরা ২০০৲ টাকা করে ডিভিডেন্ট বিলেতে পাঠাবার সুবিধা হবে না। দেশের ধান চাল যদি দেশে থেকে যায় তা হলে খুব সম্ভবতঃ লোকে পেট ভরে খাবে, পেট ভরে খেলেই শান্তিরক্ষার যে প্রধান সহায়—ম্যালেরিয়া, প্লেগ, ডিসপেপসিয়া সেগুলো লোপ পেয়ে দেশে অশান্তির মাত্রা বাড়তে পারে! এটা সত্যি কথা, মানতেই হবে যে ইংরেজেরা এই দেড়শ বছরে দেশটাকে যত ঠাণ্ডা করে এনেছে, পাঠানেরা আগে পাঁচশ বছরেও তা পারেনি।”

কথাগুলো আমার বাঁকা বাঁকা মনে হল্লো। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—“আচ্ছা পণ্ডিতজী, তুমি কি সত্যি সত্যিই মনে কর যে ইংরাজ রাজত্বের চেয়ে পাঠান রাজত্ব ভাল?”

পণ্ডিতজী আধ হাত জিভ কেটে বল্‌লেন—“আরে রামচন্দ্র! এ কথা আমি আবার কখন বল্‌লুম? আমি ত আর সত্যি সত্যি প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে মরিয়া হয়ে বসিনি! কালাপানিতে ফিরে যাবার বিশেষ আগ্রহও আমার নেই। আমাদের দেশের অনেক ইংরাজী-পড়া পণ্ডিত পাঠানের নাম শুনেই তাঁদের বড় সাধের ডিমক্রেশীর শতেক খোয়ার হবে ভেবে কাতর হয়ে উঠেছেন, তাই বদ্‌ অভ্যাস বশতঃ ঐ সব কথা গুলো

বলে ফেললুম। যক্ষ্মাকাশে শুকিয়ে-শুকিয়ে মরে বেশী লাভ, কি কলেরায় দুই একটা দমকা ভেদ হয়ে মরায় বেশী ভাল—এ নিয়ে অনন্ত কাল তর্ক চলতে পারে; বিশেষ কোন সুমীমাংসার আশা আছে বলে মনে হয় না। তবে কোন পণ্ডিত যদি মনে করেন যক্ষ্মারোগী হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে না মরতে পার্‌লে স্বরাজ্য—থুড়ি, স্বর্গরাজ্য লাভ হবে না, তা হলে তাঁর বিস্তার বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছা হয়।

---

(২১)

আধ্যাত্মিক

Famine Insurance Fund.

সে দিন আবার গোপাল দা'র সঙ্গে দেখা করতে গিছলাম। প্রায় ডজন খানেক শিষ্য-সেবকের মাঝখানে দাদা বিরাজ করছেন! দেখলুম এই তিন মাসের মধ্যেই কাঁচা, ডাঁশা, আধ-পাকা, থস্‌-থসে পাকা, অনেক রকম শিষ্যিই দাদার জুটেছে; এক আধটা শিষ্যাণীরও অভাব হয় নি। তবে কচি ২ তাল শাঁসের মত শিষ্যের সংখ্যাই কিছু বেশী! একটী ছোট্ট ছেলে মাষ্টারের মারের জ্বালায় non-co-operate করে এসে দাদার কাছে ধর্ম্মজীবন নিয়েছে। ছেলেটীর এমনি গভীর বৈরাগ্য যে দাঁতের ছ্যাতলাটুকু পর্য্যন্ত মাজে না, চোখের পিঁচুটিটুকু পর্য্যন্ত পোঁছে না—পাছে এই নশ্বর শরীরের উপর আসক্তি এসে পড়ে। দাদা নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে ছেলেটীর যে রকম গভীর নিষ্ঠা আর ভক্তিমার্গে সে যে রকম বন্‌ বন্‌ করে ছুটেছে তাতে দু দিন পরে সে ধ্রুব প্রহ্লাদের মাসতুতো

ভাই হয়ে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে। ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা করলুম—"বাপু, কি কর?" ছেলেটী উত্তর করলে—"গুরু মহারাজ যা' করান।" ভক্তিটা এমনি ছোঁয়াচে জিনিষ সে শুনে আমার পাষাণ প্রাণও গলে পাঁক হয়ে যাবার জোগাড় হলো; আর থেকে থেকে শরীরটা পুলকে ঝিলিক মেরে উঠতে লাগলো। ইচ্ছে হলো একেবারে দাদার পায়ে আছাড় খেয়ে গিয়ে পড়ি।

ও-পাড়ার যদু পোদ্দারের ছেলেকে দাদা ওজস্বিনী ভাষায় আত্ম-সমর্পণের মাহাত্ম্য বোঝাচ্ছিলেন। ছেলেটী কিছু দিন আগে লোহার ব্যবসায় বেশ দু পয়সা কামিয়েছিল। সেই অবধি দাদা আবিষ্কার করে ফেলেচেন যে পূর্ব্বজন্মে ঐ ছেলেটীর সঙ্গে তাঁর একটা গভীর আধ্যাত্মিক যোগ ছিল। এ জন্মে যাতে যোগটা বেশ পাকাপাকি হয়, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র থেকে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে নেমে আসে তার জন্যে দাদা উঠে পড়ে লেগেছেন। গুরুর নামে সর্ব্বস্ব অর্পণ করে দিলেই স্বয়ং ভগবান যে সে দান হাত বাড়িয়ে নেবেন, নানাশাস্ত্র মন্থন করে এই সার-সত্যটুকু গোপাল দা' তার কাণের মধ্যে বিন্দু বিন্দু করে ঢেলে দিচ্ছিলেন। বিশ হাজার টাকায় যে বৈকুণ্ঠে একটা 1st class berth reserve (ফাষ্টক্লাস বার্থ রিসার্ভ) করা যায় সে কথা ত বেল্লিক পুরাণে স্পষ্টই লেখা আছে! আর তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় ত গীতা খানাই পড়ে দেখ না! ভগবান স্বয়ং যে বলে যাচ্ছেন—"যোগক্ষেম বহাম্যহম্" তার মানেটা কি? আধ্যাত্মিক পথের কাঁটা খোঁচা ত সাফ হয়ে যাবেই, অধিকন্তু ইহকালেও তোমার বিজয়-রথ একেবারে লোকের বুকের উপর দিয়ে গড়গড়িয়ে চলে যাবে! ভোগ আর মোক্ষের একদম সাফ্ সমন্বয়! বস্, আউর কেয়া?

যোগক্ষেমের ব্যাখ্যাটা শুনেই আমার কপালের তৃতীয় নেত্রটা হাঁ

করে চেয়ে উঠলো। তাই ত! আমার গীতাজ্ঞানটা একেবারে মরচে ধরে গেছে দেখছি! ভগবান যে তাঁর অপোগণ্ড ভক্তগুলির জন্যে একটা Famine Insurance Fund খুলে রেখেছেন, সে কথাটা আমার মনেই ছিল না। এই যে এদেশের তেত্রিশ কোটি জীব 'হা অন্ন হা অন্ন' করে মরছে—কি ভীষণ বোকা এ গুলো! রোদে পুড়তে হবে না, জলে ভিজতে হবে না, লাঙ্গল চষ্‌তে হবে না, ধান ভানতে হবে না—শুধু একবার চোখ কাণ বুজে দাদার ভক্তের খাতায় নাম লিখিয়ে ভগবানের ভাণ্ডারের চাবিকাটিটী হাতে নিয়ে বসে পড়। কারণ-লোকের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তখন হাঁড়ি২ রসগোল্লা আর পান্তুয়ায় তোমার ঘর একদম বোঝাই হয়ে যাবে। দেশে দুর্ভিক্ষ?—আরে তাতে কি? ভগবান অভক্তদের ঘাড় ভেঙ্গে ভক্তদের খ্যাঁটের ব্যবস্থা করে দেবেনই। এমন না হলে তাঁর দয়াল নামে কলঙ্ক হবে যে!

ভাবতে ২ আমার চোখে একেবারে প্রেমাশ্রুর বান ডেকে গেল। আমি স্থির করলুম যে এখনই আমার সর্ব্বস্ব অর্থাৎ নগদ তিন টাকা ছয় আনা দাদার পায়ে ধরে দিয়ে পরকালের না হোক্, ইহকালের জন্য একটা আটকে বাঁধবার ব্যবস্থা করবো। কিন্তু দাদা সেদিন বিশহাজারী কাপ্তেনকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন বলে আমার তিন টাকা ছ আনা পকেটেই রয়ে গেল।

তার পর দিন পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা হতেই মনে হলো দিই একবার তাঁকে যোগক্ষেমের ঠেলাটা দেখিয়ে। ভারি তিনি মাঝে ২ সাধুদের ঠাট্টা করেন যে! কিন্তু গোপাল দ'ার যোগশক্তির বলে কি রকম অর্থসিদ্ধি হয়েছে তা শুন্‌তে না শুন্‌তেই তিনি হাত পা ছড়িয়ে হোঃ হোঃ করে হাসতে আরম্ভ করে দিলেন। লোকটা কি পাষণ্ড গো!

আমার ভারি রাগ ধরে গেলো। বল্লুম—"তুমি কি বল্‌তে চাও তা'

হলে যে টাকা টাকা করে মানুষ ছুটোছুটি করে না বেড়ালে তার আর পেটের জ্বালা ঘুচবে না ?"

পতিতজী বললেন—"আরে পাগল, তা নয়, তা নয়। যারা নারায়ণকে পায় তারা সঙ্গে ২ লক্ষ্মীকেও পায়, কিন্তু চোখ্‌ বুজে তুই একবার বস্‌তে না বস্‌তেই যাঁরা মনে করে যে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুটে নেবে তাদের ডিগবাজী খেয়ে চিৎ হয়ে পড়তে বড় বেশী দেরী লাগে না। আর মেয়েরা ভগবানের মুখে একটা কথা বসিয়ে দিয়েছে জানিস ত ?—"যে করে আমার আশ, করি তার সর্ব্বনাশ। তবুও যে করে আশ, হই তার দাসের দাস॥" ভগবানকে দাসের দাস করবার আগে নিজের সর্ব্বনাশটা করতে হয়।"

---

(২২)

প্রেম ও ডাণ্ডা।

মেজে ঘসে রূপ আর ধরে বেঁধে প্রেম—এটা নাকি হবার জো নেই। কিন্তু আমার মনে হয় এত বড় মিথ্যে কথা দুনিয়ায় খুব কমই পাচার হয়েছে। মেজে ঘসে যদি রূপ না ফুটতো তা হলে ত আমাদের থিয়েটার গুলো এতদিন অচল হয়ে যেতো। এই দেখনা আমাদের ক্ষেঁদি সুন্দরীকে। ইনি যখন আলুচেরা চোখ দুটিতে সুরমা লাগিয়ে, চুলগুলি ফুলিয়ে দিয়ে কপালের পরিমাণ ঢেকে ফেলে, জোঁকের মত ঠোঁট দুখানিতে তরল আলতা লাগিয়ে সুমুখে এসে দাঁড়ান তখন সাক্ষাৎ দুর্ব্বাসার দশ

হাজার বছরের তপস্যা ভেঙ্গে যাবার জোগাড় হয়ে যায়। অরূপের মধ্যে রূপ ফোটান—এই ত সৃষ্টির গোড়ার কথা!

আর তার পর ধরে বেঁধে প্রেম। হয় না বলছ? বলি জাহাঙ্গীর বাদসা যখম নুরজাহান বিবিকে বর্দ্ধমান থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলেন তখন ব্যাপারটা যে খুব নন্-ভায়োলেণ্ট রকমের হয় নি একথা ইতিহাসে ত লেখে। বেগম সাহেব যে প্রথমটা চোটে একেবারে লাল হয়ে তাঁর সতীত্ব প্রমাণ করেছিলেন, এ প্রমাণও পাওয়া যায়। কিন্তু তিন দিন না যেতে যেতে রাগের লালটুকু যে প্রেমের গোলাপীতে পরিণত হয়েছিল এ কথা ত আর অস্বীকার করবার জো নেই! ম্যাদামারা ভালমানুষ স্বামীর স্ত্রী হয় দজ্জাল; আর দস্যি জবরদস্ত স্বামীর স্ত্রী হয় একেবারে মেনি বেড়ালটীর মত পতিব্রতা--কেন বল দেখি? আসল কথা হচ্ছে মেয়েরা চায় একটু খানি জবরদস্তি। স্বামী যেখানে মডারেট, স্ত্রী সেখানে একদম্ সাফ্রেজিট (suffragette)

রাজনীতিতে যেমন দুটো রাস্তা, মডারেট (Moderate) আর এক্সট্রিমিষ্ট), প্রেমনীতিতেও ঠিক তাই। এই কালের মডারেট প্রেমিকেরা লতানে চুলে সিথিঁ কেটে প্রেমিকার পানে কাতর দৃষ্টি হান্‌তে হান্‌তে কবিতার খাতা বোঝাই করেন; আর সে কালের এক্সট্রিমিষ্ট প্রেমিকেরা বেরালে যেমন করে ইঁদুর ধরে তেমনি করে প্রেমিকাকে বগলে পুরে ঘোড়ায় চড়ে পগার পার হতেন। ছিঁচ কাঁদুনে প্রেমের চেয়ে যে মিলিটারী প্রেমটা জমতো ভাল তার সাক্ষী ইতিহাস আর পুরাণ। আমাদের প্রপিতামহীরা যে প্রপিতামহদের সঙ্গে চিতায় পুড়ে স্বর্গে চলে যেতেন, সেটা শুধু স্বর্গে গিয়েও ঐ মিঠে মিঠে জবরদস্তিটুকু পাবার লোভে। বিশ্বাস না হয়, ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

রাজনীতির দিকেও চেয়ে দেখ না।° সেখানেও প্রেম আদায় করবার মন্ত্র হচ্ছে জবরদস্তি। ওয়াশিংটন যদি কাঁদুনি গেয়ে বলতেন যে আমেরিকা স্বাধীন করে না দিলে তিনি মনের দুঃখে সাত রাত্রি উপোস করে মারা যাবেন, না হয় গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, তা হলে আজ আমেরিকার দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদতো। আজ যে ইংরেজ আমেরিকার সঙ্গে প্রেমে পড়বার জন্যে এত ব্যস্ত, তার মূলে হচ্ছে ঐ ওয়াশিংটনের ডাণ্ডা। তাল বুঝে ঐ ডাণ্ডা লাগাতে পারলে নবদ্বার ভেদ করে প্রেমের প্রবাহ ছুটবেই ছুটবে।

* * * *

আরে দাদা, প্রেমনীতি, রাজনীতির কথা কি বলছো, গুতোর চোটে ভগবান পর্য্যন্ত প্রেম করতে রাজী হয়ে পড়েন। মিত্র ভাবে সাত জন্মে আর শত্রু ভাবে যে তিন জন্মে মুক্তি হয় এটা হিঁদুর ছেলে হয়ে ত অস্বীকার করবার জো নেই! আরে না, না—এটা সেকেলে থিওরি মোটেই নয়। আমাদের হারু গয়লা কি করে তিন দিনে সিদ্ধপুরুষ হয়ে গিছলো তা শোননি বুঝি? কিছুই খবর রাখ না; তবে শোন বলি।—

বৈশাখ মাসের রোদে সারাদিন বাঁকে করে দুধ বয়ে বয়ে সন্ধ্যার সময় হারু বাড়ী ফিরে দেখলে যে তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বৌ চলে গেছে বাপের বাড়ী। উনুনে আগুনটা পর্য্যন্ত পড়ে নি। লোকে বলে গয়লার ছেলের আশী বছরের আগে বুদ্ধি খোলে না; কিন্তু পেটের জ্বালায় হারুর তখনি তখনি জ্ঞান ফুটে উঠলো। সে দিব্য চোখে দেখতে পেলে যে সংসারটা একেবারে মরুভূমি। বৈরাগ্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বেদ না পড়েও বুঝতে পারলে যে "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।" কাঁধে একখানা গামছা ফেলে বাঁকটা হাতে করে সে সন্ন্যাসী হবার জন্যে বেরিয়ে পড়লো। চলতে চলতে এক শিবমন্দিরে এসে সে রাতটা কোন

রকমে কাটিয়ে দিলে। তার পর দিন হাজার হাজার লোক শিবের মাথায় জল দিতে এলো। কত চাল কলা সন্দেশ এসে স্তুপাকার হয়ে পড়লো; কিন্তু গয়লার পোর খোঁজ খবর কেউ আর করলে না। একে বৈরাগ্য তার উপর দুদিন অনাহার; কাজেই হারুর মেজাজটা ক্রমেই চড়ে উঠতে লাগলো। তার পর দিন সকাল বেলা সে গামছাখানি কোমরে বেঁধে বাঁকগাছটা হাতে নিয়ে একেবারে চৌমাথার মোড়ে এসে দাঁড়ালো। যেই যাত্রী আসে, অমনি দে-ধনাধন্, মার ধনাধন্। যাত্রীরা ত প্রাণ নিয়ে যে যেদিকে পারলে চম্পট দিলে। এ দিকে বৈশাখ মাসের দিন, শিবের মাথায় এক ফোঁটাও জল পড়ে নি। শিব ঠাকুরের মাথা ক্রমেই গরম হয়ে উঠতে লাগলো। তিনি ষাঁড়কে বল্লেন—"বাবা ষাঁড়, দেখ্‌তো আজ ব্যাপার কি? যাত্রী কেন আসছে না?" ষাঁড় খুঁজতে খুঁজতে চৌমাথার মোড়ে এসে গয়লার কীর্ত্তি দেখে ত চোটে লাল। কিন্তু যাই শিং নেড়ে তেড়ে যাওয়া অমনি বাঁক পেটা খেয়ে উর্দ্ধপুচ্ছ হয়ে দৌড়। রিপোর্ট পেয়ে শিব মহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নন্দীকে ডেকে বল্‌লেন —"একবার দেখতো ঐ গয়লা বেটা কি চায়?" নন্দী এলো; কিন্তু হারু তার দিকে ফিরেও চাইলে না। বাঁক কাঁধে করে তেমনি গট্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এদিকে বেলা তিনটে বাজে; শিবের মাথায় জল নেই, পেটে অন্ন নেই; বাবাঠাকুর ত একেবারে ক্ষেপে যাবার জোগাড়! করেন কি? আস্তে আস্তে উঠে নিজেই হারুর কাছে এসে হাজির হয়ে বল্লেন —"বৎস, তুমি কি বর চাও? তোমার উপর তুষ্ট হয়েছি। তোমার বুদ্ধি যে রকম ক্ষুরধার দেখছি, তুমি রাজনীতির চর্চ্চা করলে একটা বড়দরের পেট্রিয়ট হতে পার্‌তে।" হারু বললে—"বড় দরের পেটেল মেটল আমি হতে চাই নে; আমি চাই রোজ একপেট ভাত আর তিন ছিলিম গাঁজা।" শিব তথাস্তু বলে অন্তর্দ্ধান হলেন, আর হারুও বাঁক কাঁধে

করে মন্দিরে ফিরে এলো। সেই অবধি শিব ঠাকুর তাঁর সেবায়ৎকে, স্বপ্ন দিয়ে বরাদ্দ করে দিয়েছেন যে, তাঁর ভোগ হবার আগে হারুর ভোগ হবে।

দেখগে যাও, আজ পর্য্যন্ত হারু সেই মন্দিরে পড়ে আছে—মাথায় জটা, কোমরে কৌপীন আর হাতে গাঁজার কল্কে।

এর পরও ডাণ্ডার মহিমায় যে বিশ্বাস না করবে, সে ম্লেচ্ছ, সে নাস্তিক।

---

(২৩)

বিয়ে ও পিণ্ডি।

দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে শুতে গিয়ে দেখি টেবিলের উপর একখানি চক্চকে খামে মোড়া নেমন্তন্ন-পত্তোর। লুচির সম্ভাবনায় আমার ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মী মনটা প্রায় নেচে ওঠবার জোগাড় করেছিল, এমন সময় চিঠিখানি খুলে দেখি—হা পোড়া কপাল!—অম্বুলেটোলার প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ পাংশুলোচন রায়ের সভাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ঘটোৎকচ স্মৃতিরত্ন জানিয়েছেন যে মহারাজের বাড়ীতে আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে এক মহতী সভার অধিবেশন হবে, আর সেখানে আমার মত স্বধর্ম্ম-নিরত পুরুষের সবান্ধবে উপস্থিতি প্রার্থনীয়!

বান্ধবের মধ্যে ত' এক পণ্ডিতজী। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—"দাদা, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যে আন্তর্জাতিক বিবাহ আইনের ধাক্কায় একেবারে বেঁকে পড়বার জোগাড় হয়েছে। এখন আমরা পাঁচজন ব্রাহ্মণ-সন্তান তাকে ঠেক্না দিয়ে সোজা করে না রাখলে আর উপায় কি?"

পণ্ডিতজী বললেন—ও সবে আমি নেই, ভাই! জানই ত, নারী হলো নরকস্য দ্বারং। তার আবার জাতি বিচার কি? নরকেই যদি যেতে হয় ত কুম্ভিপাকে যাব, কি রৌরবে যাব, তা বিচার করে আর কি হবে? তা ছাড়া বিয়ের বয়স আর আমার নেই। আর যদিও থাকতো, তা হলে তোমরা নারী-স্বাতন্ত্র্য লিখে লিখে ব্রাহ্মণীকে এমনি বিগড়ে দিয়েছ যে কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আমার আর বিয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ করবার সাহস হতো না।"

পণ্ডিতজীকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবার অবসর দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলুম—"বিয়েটা হলো ধর্ম্ম সংস্কার। ছেলেগুলো জাত-বেজাতের মেয়ে ঘরে এনে ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাশ করে দেবে, আর তোমার মত পণ্ডিত লোক যে শুয়ে শুয়ে তা দেখবে—এটা কি ভাল?"

পণ্ডিতজী হেসে উঠে বললেন—"আরে, পণ্ডিতও বটে, ব্রাহ্মণও বটে কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ত আর নই! ধর্ম্ম বেচে ত আর আমার খেতে হয় না! বিয়েটা যে ধর্ম্ম সংস্কার তা বিলক্ষণই জানি—যেহেতু আমার পূর্ব্ব-পুরুষদের এই রকম ধর্ম্মসংস্কার করাই ছিল জাত-ব্যবসা। আমার প্রপিতামহ ছত্রিশ বছর বয়সে স্বর্গলাভ করেন। এই বয়সের মধ্যে তিনি তেষট্টিবার ধর্ম্মসংস্কার করে তেষট্টিটি ধর্ম্মপত্নী সংগ্রহ করেছিলেন। এ-হেন আর্য্যকুলপ্রদীপদের বংশতিলক আমি—আমি আর, হিন্দু বিবাহের মাহাত্ম্য বুঝি নে? আসল কথাটা কি জান, বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্চে যে যখন মরে গিয়ে ভূত হবো, তখন ঐ ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত পুত্র আমার আতপ চালের পিণ্ডি চটকে খাওয়াবে। সে কালের কর্ত্তারা যার তার হাতের রাঁধা ভাত ত আর খেতেন না, তাই তাঁরা বেছে বেছে স্ববর্ণে বিয়ে করতেন। এখন আমাদের ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই যখন নেই, আমরা সবাই যখন ঈষৎ পাটখিলে বা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, তখন স্ববর্ণ দেখে

বিয়ে করলেই চলবে, তা সে যে জাতই হোক না কেন। যার তার হাতের ভাত খাই আর না খাই, পাউরুটি ত খাই। ছেলে না হয় পাউরুটিতে মাখন চটকে আমাদের পিণ্ডি দেবে! প্রেতলোকে সে একটা রাজভোগ হয়ে দাঁড়াবে। আলো চালের পিণ্ডি খেয়ে খেয়ে যে-সব প্রেতের অরুচি হয়ে গেছে, তাঁরা তখন তাঁদের বংশধরদের কি রকম বিয়ে করতে স্বপ্নাদেশ দেন তা দেখে নিও। ময়রার মেয়ে বিয়ে করলে যদি কাঁচাগোল্লার পিণ্ডি খাওয়া যায় ত তাতে কোন সুব্রাহ্মণের আপত্তি হবার কথা নেই!"

বিয়ের শাস্ত্র সঙ্গত থিওরির এ রকম অর্ব্বাচীন ব্যাখা শুনে আমার মনে ব্রাহ্মণোচিত ক্রোধের সঞ্চার হবার উপক্রম হয়েছিল। আমি একটু তীব্রকণ্ঠে বলে ফেললুম—"তুমিই না হয় কুলীন বামুনের বংশধর; প্রপিতামহীদের গুণে তোমাদেরই রক্তে না হয় সর্ব্ববর্ণ সমন্বয় হয়ে গেছে; কিন্তু দেশশুদ্ধ লোক ত আর কুলীন বামুন নয়—তারা নিজেদের আভিজাত্য ছাড়তে যাবে কেন?"

পণ্ডিতজী হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বললেন—"মুসলমানদের একটা কথা জানত—

'আগে হয় উল্লা তুল্লা, পরে হয় উদ্দীন
তলার মহম্মদ উপরে যায় ভাগ্য ফিরে যদ্দিন।'

নমঃশূদ্রদের রামচরণ যদি আজ মুসলমান হয়, ত তার নাম হয়ে যাবে রহিমুল্লা। চাষ বাস করে দু দশ বিঘে ধেনো জমি যে দিন তার হবে, সে দিন সে নাম নেবে রহিমুদ্দিন। অদৃষ্ট ফিরে গিয়ে সে যদি সহর অঞ্চলে একটু বাড়ী টাড়ী করে ত, তার নাম হয়ে যাবে রহিমুদ্দিন মহম্মদ। আর তার ছেলে যখন চোখে সোণার চশমা এঁটে, তুর্কী ফেজ মাথায় দিয়ে কলেজে পড়তে যাবে, তখন তার বাপের নাম জিজ্ঞাসা করলে বলবে

সৈয়দ মহম্মদ রহিমুদ্দিন। এ সব কথা মুসলমানের পক্ষেও যেমন সত্যি; হিন্দুর পক্ষেও তাই। প্রথম পুরুষে যারা ছোটনাগপুরের সাঁওতাল, দ্বিতীয় পুরুষে বীরভূম বা বাঁকুড়ায় এসে তারা হয়ে যায় গোয়ালা। তৃতীয় পুরুষে তারা হুগলী জেলায় সদ্‌গোপ; আর চতুর্থ পুরুষে কল্‌কাতায় এসে দস্তুর মত কায়স্থ। "জাত হারালে কায়েত"—কথাটার উৎপাত্ত কোথা থেকে হলো, জান? পাঁচজন বামুন আর পাঁচজন কায়স্থ—যাঁরা কান্যকুব্জ থেকে সস্ত্রীকে এসেছিলেন বলে বিশেষ প্রমাণ নেই—তাঁরা যে 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' এ শাস্ত্রবাক্য অবহেলা করেছিলেন, এ কথা ত ঘটকদের সার্টিফিকেট পেলেও বিশ্বাস হয় না। নেপালে একদল হিন্দুস্থানী বামুন দেখেছিলাম যারা নিজেদের মায়ের হাতের রান্না খায় না! খোঁজ করে দেখলুম যে তাদের বাপেরা নেপালে এসে ছোট জাতের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। বিবাহটা ফুল ফেলে, মন্ত্র পড়ে শাস্ত্র মতেই হয়েছিল; তবে মেয়ে ছোট জাতের বলে তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদের রান্না ভাত খেতেন না। তাঁদের ছেলেরাও বড় হয়ে পৈতে ঝুলিয়ে বামুন হয়েছে; কেবল জাতটুকু বাঁচাবার জন্যে নিজেদের মায়ের হাতের রান্না খায় না। বাঙলাদেশেও যদি খোঁজ কর ত দেখবে যে "হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য, হেথায় দ্রবীড়, চীন"—মিলে এমন খিচুড়ি পাকিয়েছে যা পুরীর জগন্নাথের ভোগে দেওয়া চলে। এতদিন পরে অসবর্ণ বিয়ে বলে নাক সিঁটকান বাংলায় আর ভাল দেখায় না।"

আমি পণ্ডিতজীর মুখটা টিপে বললুম—"থাম থাম। এ সব কথা রাস্তায় ঘাটে যেখানে সেখানে বলো না। কোন দিন এক নবীন ক্ষত্রিয়ের হাতে পড়ে তুমি অকালে প্রাণ হারাবে।"

পণ্ডিতজী বললেন—"ভয় নেই রে, ভয় নেই। তারা মসী ছেড়ে অসি এখনও ধরে নি। তোমার ঐ অম্বুলেটোলার রাজার মত ক্ষত্রিয় ত?

যাত্রার দলের নন্দঘোষের মত চূড়ায় শিখিপুচ্ছ বেঁধে গোঁফের সূর্য্যবংশী কাটছাঁট করলেই যদি ক্ষত্রিয় হতো তা' হলে আর ভাবনা ছিল কি? তাঁর নাতনিকে ললিত কলা শেখাবার জন্যে যে দুজন বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীর আমদানী করা হয়েছিল, তাদের বাগান বাড়ীতে যাতায়াত নিয়ে যে কেলেঙ্কারী রটেছিল তা তো এখনও মনে আছে! এঁরাই না তোমার বর্ণাশ্রমের স্তম্ভ? রক্ষে কর, বাবা, আর ডেঁপোমিতে কাজ নেই।"

আমিও বললুম—"তাই ভাল; অসবর্ণ বিয়ে রোধ করতে গিয়ে কি শেষে একটা খুনোখুনি করে বসব?"

---

(২৪)

দেবতার বাহন।

আজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের Nonsense Club বেশ জমাট হয়ে উঠেছে। ফিস্ ফিস্ করে বৃষ্টি পড়ছে, কাজেই কারও আর বাইরে যাবার জো নেই। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে গদাই সরকার পর্য্যন্ত আজ বৈঠকে হাজির। গদাইকে দেখেই আমাদের কবিকঙ্কণ মিহি সুরে বলে উঠলেন —"আরে গদাই যে! তোরও যে দেখছি দেবত্ব লাভের দিকে নজর পড়েছে!" গদাই হাত জোড় করে বল্‌লে—"আজ্ঞে, আপনারা ত ইহলোকেই দেবতা হবার জোগাড় করচেন; কিন্তু বাহনের কথাটা একবারও ভাবন নি ত! গদাই সরকার দেবতা হতে না পারুক, বাহন ত হতে পারে। সেই আশায় একবার দেব-সমাজে উঁকি মারতে এসেছি।"

বাইরে বৃষ্টি বেশ ঝম্ ঝম্ করেই আরম্ভ হচ্ছিল। পণ্ডিতজী তাঁর

বিপুল দেহভারখানি তুলে একটা সারশি বন্ধ করে দিয়ে বল্লেন—"ঠিক বলেছিস্, গদাই। তোর মত বাহন না হলে আমার দেবত্বের খোলতাই হবে না। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, শীতলার বাহন গাধা, গণেশের বাহন ইঁদুর—এদেরও যখন দেবলোকে জায়গা জুটেছে, তখন আমার বাহন গদাই সরকারেরও স্বর্গের আস্তাবলে একটু ঠাঁই হয়ে যাবে। ভয় নেই তোর; আমায় দেখতে যেমন, ওজনে আমি ততটা ভারি নই। আর দেবতা হলেই সূক্ষ্মশরীর হয়ে যাবে; তোর চাপা পড়বার কোনই ভয় থাকবে না। তা ছাড়া স্বর্গের আস্তাবলে চিণ্ময় ঘাস জলের সঙ্গে সঙ্গে তোর দু'চার ফোঁটা অমৃতও কোন না মিলে যাবে?"

গদাই লাফিয়ে উঠে বল্‌লেন—"পণ্ডিতজী ঐটে মাফ্ করতে হবে। কুকুরের নাড়ীতে ঘি হজম হবে না; আমার পেটেও অমৃত হজম হবে না। শেষে কি অমর হতে গিয়ে বদন ডাক্তারের ঘোড়ার মত হাস্‌তে হাস্‌তে মরে যাব?"

কবিকঙ্কণ তাঁর কোঁকড়া চুলের গোছা কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে চক্ষু দুটী অর্দ্ধনিমীলিত করে বল্‌লেন—"কাব্যশাস্ত্রে দশ বিশ রকমের হাসির তালিকা পাওয়া গেচে; কিন্তু ঘোড়ার হাসি!—একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে?"

গোদাই চক্ষু দুটী বিনয়-নম্র করে বল্‌লে—"ওগো রঘুকুলপতি, তোমাদের মহিমায়—জলে শিলা ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়—আর ঘোড়ায় হাসতে পারে না? তা ছাড়া, এ যে আমার স্বচক্ষে দেখা। বদন ডাক্তারকে চেন ত? যার নাম করলে গেরস্তর হাঁড়ি ফেটে যেত? তার পক্ষীরাজের জুড়িটী চিরকাল ঘাস জল খেয়ে মানুষ। একবার কলেরার ধুম পড়ে যেতে ডাক্তারের টাকার থলি ফাটো ফাটো হয়ে দাঁড়াল। তখন তিনি খুসী হয়ে সহিসকে হুকুম দিলেন—"ঘোড়াকে দানা

খাওয়াও।” ঘোড়া দুটো সমস্ত দিন টঙ্গস্ টঙ্গস্ করে ঘুরে এসে আস্তাবলে গিয়ে দেখে ঘাসের বদলে দানা। এ ওর মুখের দিকে চায়, ও এর মুখের দিকে চায়। শেষে দুটোতেই একেবারে চিঁহি চিঁহি করে হাসতে হাসতে চার পা তুলে নৃত্য আরম্ভ করে দিলে। সহিস, কোচম্যান চারি দিকে ছুটোছুটি করতে লাগলো; ডাক্তার বাবু চেঁচাতে লাগলেন— “আরে ঘোড়ার মাথায় বরফ দে, বরফ দে।” কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হলো না। ঘোড়াদের সে হাসি আর থামলো না। হাসতে হাসতে পেটের বত্রিশ নাড়ীতে মোচড় খেয়ে শেষে অশ্বিনীকুমারদের হলো পতন ও মৃত্যু। দেবতার ভোগ্য অমৃতে ভাগ বসাতে গিয়ে আমারও কি শেষে সেই দশা হবে?”

পণ্ডিতজী ঘাড়টী ঈষৎ নেড়ে বললেন—“তাই ত, গদাই, তুই দেবলোকেও থাকতে চাস, অথচ অমৃতে তোর অরুচি! তোকে নিয়ে যে বিষম জ্বালায় পড়লুম! তোর মতলবটা কি বল দেখি?”

আমাদের যশুরে কৈ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এইবার তার প্রকাণ্ড মাথাটী নেড়ে বক্তৃতা সুরু করে দিলে।—“যদি অভয় দেন, দেবগণ, ত আমি গদাই এর মনের কথা বলে দিতে পারি, কেন না যৌবনে আমি কাকচরিত্র, হনুমানচরিত্র প্রভৃতি গুপ্তবিদ্যা কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করেছিলুম। গদাই দেবতাও হবে না, দেবতাদের বাহনও হবে না। দেবতা হবে না যেহেতু ঐ গোবরের পিণ্ডে কোন দেবতা যদি পথ ভুলে ঢুকে পড়েন, ত তিনি তিন দিনে দম আটকে মারা যাবেন; আর বাহন হবে না যেহেতু তার পৃষ্ঠদেশ এ যাত্রার মত একেবারে রিজার্ভ করা হয়ে গেছে। বিশ্বাস না হয়, গদাইএর বাড়ী গিয়ে যে সজীব আহ্লাদী পুতুলটী একসঙ্গে তার ঘর, প্রাণ আর পিঠ জুড়ে বসে আছে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।”

পণ্ডিতজী এই কথা শুনেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বার জোগাড় করছিলেন, কিন্তু আশেপাশে জায়গা নেই দেখে মূর্চ্ছাটা সামলে নিয়ে মরাকান্না জুড়ে দিলেন:—"গদাই রে, তোর মনে কি এই ছিল! আমি কোথায় ভাবছিলুম, তোকে এক ফোঁটা অমৃত প্রসাদ দিয়ে চিরদিনের জন্যে আমার বাহন করে রেখে দেব, আর তুই যোগ আরম্ভ করতে না করতেই একেবারে ভ্রষ্ট হয়ে বসে আছিস! যাক, কালই আমি মনের দুঃখে বনে গিয়ে তোদের সঙ্গে নন্‌-কো-অপারেশন আরম্ভ করে দেব।"

গদাই শশব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে—"দোহাই পণ্ডিতজী, আপনার দীন হীন বাহনটীর উপর অবিচার করবেন না। বিবাহ রূপ দুষ্কার্য্যটা যদি করেই থাকি ত আপনার বাহন প্রতিপালনের খরচটা একটু বেড়ে যাবে বটে, কিন্তু তেমনি একটীর বদলে একজোড়া বাহন পাবেন যে! আর খরচটাও খুব বেশী বাড়বে না, যেহেতু যুগধর্ম্মের অনুশাসন মাথায় পেতে নিয়ে দাস সৃষ্টি করবার পক্ষে গৃহিণীকে আমি কোন রকম সাহায্য করিনে। এমন কি, দেশে এখন কাপড়ের নিতান্ত অভাব দেখে আমি স্থির করেছি যে ১লা অক্টোবর থেকে অন্নবস্ত্র ত্যাগ করে কলাপাতা পোরবো ও অগ্নিস্পর্শ করে কদলী ভক্ষণ করবো। এ বিষয়ে আপনার কি অভিমত?"

পণ্ডিতজী প্রসন্ন বদনে বললেন—"ভক্তরে, তোমার জয় হোক। দগ্ধ কদলীর দিকে তোর অকৃত্রিম অনুরাগ দেখে আমি তুষ্ট হয়েছি। এখন তুই কি বর চাস্‌, নে।"

---

(২৫)

সাত্ত্বিক নেশা।

"তোমরা কেউ গুলি খেয়েছ? খেয়ে থাক ত লজ্জিত হবার কারণ নেই। গুলি আফিমের রাজসংস্করণ; অতি বাদসাহী নেশা!"

পণ্ডিতজীর প্রশ্নটা শুনে আমরা সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম। ফরাসডাঙ্গায় জন্মেছি বটে, কিন্তু গুলি খাবার সৌভাগ্যটা কখন ঘটে ওঠে নি!"

আমাদের রামব্রহ্ম পাঁড়ে সেইখানে বসে ছিল। সে বল্‌লে—"আজ্ঞে, গাঁজার কল্কেয় এক আধ 'টান দিয়েছি বটে, কিন্তু—গুলি—ওটা দেখা হয় নি।"

পণ্ডিতজী নাক সিঁটকে বল্‌লেন—"আরে রাম! কোথায় গুলি আর কোথায় গাঁজা! রাজা আর পঞ্চা তেলি! গাঁজা, চরস ও সব অত্যন্ত রাজসিক ব্যাপার। টান দিয়েছ কি ধেই ধেই করে নাচতে আরম্ভ করেছ। গাঁজা খায় ছোটলোকে। আর গুলির মত শান্ত স্নিগ্ধ, মোলায়েম, সাত্ত্বিক নেশা আর দুটি পাবে না। বাদসাহী আমল চলে যাবার পর থেকে গুলির দুর্দ্দিন পড়েছে বটে; কিন্তু গুলির-আড্ডায় চিরদিন চিনির জলে সোলা ভিজিয়ে চাট খেতে হতো না। জাহাঙ্গীর বাদশা যখন ইয়ার বন্ধু নিয়ে গুলি খেতে বসতেন, আর নুরজাহান বেগম একশো আট সোণার থালে রকমারি চাট সাজিয়ে দিতেন, তখন তোমরা জন্মাও নি; কিন্তু সে ছিল এক দিন! তারপর বর্গীর হাঙ্গামার সময় আমাদের আলিবর্দ্দী খাঁ যখন মসনদে চড়ে চক্ষু দুটী ঢুলু ঢুলু করে গুলির ধোঁয়ায় সপ্তলোক ভেদ করতেন তখনও গুলির মান মর্য্যাদা বজায় ছিল।

মাঝে ইংরেজ রাজ্য আসবার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা এমন খাঁটি স্বদেশী ধুমমার্গ ছেড়ে দিয়ে বিদেশী কারণ-তরঙ্গে ভেসেছিলে বটে, কিন্তু তোমাদের সে মোহ কাটাবার দিন এসেছে! আজকাল সরকার বাহাদুরকে আর দেশের নেতাদের সর্ব্বদাই আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়, পাছে কোথাও Violence বেধে গিয়ে হাতের পাঁচ স্বরাজটা ভেস্তে যায়। তোমরা সবাই যদি ঐ সনাতন ধুমমার্গটীকে ফিরিয়ে আনতে পার ত সরকারের আবগারির আয়ও বেঁচে যাবে, আর দেশে Violence এর ভয়ও থাকবে না। লোকে মদ খেয়ে মারামারি করে, গাঁজা খেয়ে মাথা ফাটাফাটি করে—এতো সবাই দেখতে পাচ্ছ! কিন্তু গুলি খেয়ে কেউ কখনও টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করেছে শুনেছ? একটি টান মেরে ঘরের কোণে তিনটী দিন পড়ে থাক; অন্নসমস্যাও থাকবে না, বস্ত্রসমস্যাও থাকবে না। স্বরাজের আর বাকি রইল কি?"

এই দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করে পণ্ডিতজী তাঁর কামান গোঁফের উপর হাত বুলাতে বুলাতে গম্ভীর ভাবে চেয়ে রইলেন। আগামী কংগ্রেসে এই প্রস্তাবটা উত্থাপন করা যাবে কি না ভাবচি এমন সময় রাইবিলেস তার ট্যারা চোখটি আকাশপানে তুলে জিজ্ঞাসা করলে—"পণ্ডিতজী—?"

পণ্ডিতজী বিরক্ত হয়ে বললেন—"এইমাত্র তোমাদের স্বরাজ দিয়ে দিলুম, আবার কি চাই?"

রাইয়ের ট্যারা চোখটী ঘুরে এসে পণ্ডিতজীর নাকের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সে একটা ঢোঁক গিলে বল্‌লে—স্বরাজের রাস্তা আপনি বাৎলালেন বটে কিন্তু সংসারের সব জিনিষের মত এ স্বরাজও ক্ষণভঙ্গুর। এতে কি আর মানুষের দুঃখ ঘুচবে? এতদিন শুনে আস্‌ছিলুম যে মানুষ নাকি শীগ্‌গির মনুষত্ব থেকে দেবত্বতে প্রোমোশন পাবে, কিন্তু এখন শুনচি তার জন্যে তপস্যা চাই। নাক কান বুজে তপস্যা টপস্যা আমার ধাতে বড়

একটা সয় না। চট্ করে অমরত্ব লাভের একটা সোজা উপায় কিছু করতে পারেন না ?

পণ্ডিতজী তাঁর দশনপংক্তি ঈষৎ বিকশিত করে বল্লেন—"ওহো! তুমি স্বারাজ্য সিদ্ধির কথা বলছো, তার জন্যে আর ভাবনা কি? ও ত স্বরাজেরই মাসতুতো ভাই। আফিমের সঙ্গে শুধু পেয়ারা পাতা মিশালে পাওয়া যায় স্বরাজ; আর তাতে দু চার ফোঁটা গোলাপ জল ফেলে দিলে যা গড়ে ওঠে তারই নাম স্বারাজ্য। বিশ্বাস না হয়, দেখে এসো আমাদের ভোগকুণ্ডুর উৎসবানন্দ বাবাজীর আড্ডায়। বাবাজী আমার এমনি এক পেটেণ্ট মেশিন বসিয়েছেন যে একটান গোলাপী গুলি টেনে ঐ কলের মধ্যে শুয়ে পড়লেই—তিন রাত্তিরের মধ্যে তুমি চতুর্ভুজ হয়ে যেতে বাধ্য। মানুষকে মানুষ বানাতেই কত কত মহাপুরুষের হাড় হিম হয়ে এলো, আর আমার বাবাজী শুধু মানুষ কেন, গাধা, বানর ভেড়া সব ধরছেন আর চতুর্ভুজ ষড়ভুজ বানিয়ে ছেড়ে দিচ্চেন।"

রাই ছেলেটা নিতান্ত পাজি। পণ্ডিতজীর কথার উপরও আবার জিজ্ঞাসা করলে—"তারা যে চতুর্ভুজ হয়েছে তার প্রমাণ?"

পণ্ডিতজী একেবারে লাফিয়ে উঠলেন। বল্লেন—'ওরে নাস্তিক, ওরে অবিশ্বাসী—প্রমাণ আবার কি? তাঁদের দিব্যদৃষ্টি যে একেবারে সপ্তলোক ফুঁড়ে পরম ব্যোমে গিয়ে ঠেকেছে। আর চারপেয়ো তো উঠে দাঁড়ালেই চতুর্ভুজ। তার উপর তাদের গাঁটে গাঁটে এমনি গুলির মাহাত্ম্য ঢুকে গেছে যে সেখানকার এণ্ডা, বাচ্ছা, গেঁড়ি গুগলি সবাই দিনে দশ বার করে দেবলোক থেকে প্রত্যাদেশ পেতে আরম্ভ করেছে। সবাই যেন ভগবানের এক একটি প্রাইভেট সেক্রেটারি। আবার তোরা চাস কি?"

বিস্ময়ে, পুলকে আমাদের চোখদুটো ঠেলে কপালে ওঠবার চেষ্টা

করতে লাগলো। শেষে আমাদের কবিকঙ্কণ ভাবে অভিভূত হয়ে গান ধরে দিলে—

সখি, কোথা সেই দেশ রে
যে দেশের অভিধানে যোগ মানে ভোগ রে,
বাঘ মানে খেঁকশেয়ালি
ভক্তি মানে ঢলাঢলি
সমাধির মানে শুধু হিষ্টিরিয়া রোগ রে।

———

(২৬)

লাট মৈত্রেয়।

"লাট মৈত্রেয় এবার আসচেন তা শুনেছ ত?"—পণ্ডিতজী গম্ভীরভাবে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন। গদাই বল্‌লে—"লাট মৈত্রেয়টা আবার কে? নতুন বড়লাট নাকি?'

পণ্ডিতজী ব্যথিতভাবে শিরঃসঞ্চালন করে বল্‌লেন—"হায়, হায় লাট মৈত্রেয় কে তা জানিস নে? এতদিন তবে করলি কি? আমি দেহরক্ষা করলে তোদের গতি কি হবে কে জানে? ভেবেছিলুম এই মাঘী পূর্ণিমার দিন নশ্বর দেহ ত্যাগ করবো। তা তোদের দুঃখ দেখে আরও কিছুদিন থেকে যেতে হবে দেখছি। লর্ড মৈত্রেয় হলেন এ যুগের ভাবী বুদ্ধদেব! তিনি গুরু-মা এণ্ড কোং-এর কাছে তপঃলোক থেকে তার পাঠিয়েছেন যে জগতে শান্তি স্থাপনের জন্যে তাঁর আসবার সময় হয়েছে সুতরাং তাঁর প্রকাশের জন্য একটী শুদ্ধ আধার চাই। তাই কোম্পানী আধার বাছাই করতে উঠে পড়ে লেগে গেছেন। কেউ আছে নাকি তোদের সন্ধানে?

আমি বল্‌লুম—"আমাদের ক্যাবলাকান্ত তো খুব সৎ ছোকরা। ভাঙ্গা মাছটি পর্য্যন্ত উল্টে খেতে জানেনা। তা ছাড়া খুব শুদ্ধবংশ। ওর ঠাকুরদাদা আজন্মকাল আলো চাল আর কাঁচকলা ভাতে খেয়ে গেছেন। ওর জন্যে অবতারগিরির একখানা দরখাস্ত পেশ করলে হয় না?

পণ্ডিতজী হেসে বললেন—"বাপু অবতার হওয়া কি সোজা কথা! একশো আট জন্ম পূর্ব্বে থেকে তা প্র্যাকটিশ করতে হয়। এই একশো আট জন্ম সাধনার ফলে এক শো আটটী লক্ষণ অবতার পুরুষের অঙ্গে ফুটে ওঠে। মহাবেল্লিক পুরাণে সে সব লক্ষণের একটা তালিকা তোমরা দেখতে পাবে। হাঁ, ক্যাবলাকান্ত অবিশ্যি ছোকরা ভাল; কিন্তু ওর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ঈশান কোণে ঐ যে দেখছো একটী কৃষ্ণবর্ণ তিল—ওতেই সব মাটী করেছে! সাতজন্ম পূর্ব্বে একদিন অমাবস্যায় ও পিতৃ-পুরুষের তর্পণ করতে ভুলে গিছলো—ঐ তিলটী হচ্চে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কবিকঙ্কণ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে—"তাই তো—এতগুলো সুলক্ষণযুক্ত পুরুষ এই ঘোর কলিতে মেলাই মুস্কিল। আমাদের রাই বিলেস সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?"

পণ্ডিতজী রাইবিলেসের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ দেখে বললেন—হাঁ, লক্ষণ কিছু কিছু মিলছে বটে। তপ্তকাঞ্চননিভ গৌরবর্ণ রংও বটে আর দশনপংক্তিও সুগঠিত বটে। কিন্তু ঐযে মুখের মাঝখানে প্রকাণ্ড Note of interrogationএর মত একটা নাক ঝুলছে ওটা বড় সুবিধের লক্ষণ নয়। দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ আর গুহ্যাতিগুহ্য পরাবিদ্যার উপর ওর যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকবে না। অবতারশিপের যে ক্যাণ্ডিডেট হবে তার ভিতরটা যাই হোক না কেন, পরে পশ্চাতে গড়ে নেওয়া চলে; কিন্তু তার বাইরটা হওয়া চাই একেবারে রামরম্ভার মত মোলায়েম।

হলধর খুড়ো নিজের গাটা একটু টিপেটুপে বললেন—"না,—ভেবেছিলুম নামটা একবার লেখাব ; তা দেখচি গাটা দরকোচা মেরে গেছে। তা ছাড়া রংটাও যথেষ্ট পাটকিলে নয়, আর বয়েসটাও কিছু বেশী হয়ে পড়েছে।"

পণ্ডিতজী বললেন—"রংএ ততটা কিছু এসে যেতো না। কিছুদিন বিলেত ঘুরিয়ে আনতে পারলে অনেক শ্যামবর্ণও গৌরবর্ণ হয়ে ওঠে। তবে কি জান, যাঁরা অবতার বাছাইয়ের ভার নিয়েছেন, তাঁরা একটু কাঁচা বয়েসই পছন্দ করেন।"

হলধর খুড়ো সজোরে একটিপ নস্য নিয়ে বললেন—"তা তো বটেই, তাতো বটেই। কথায় বলে বুড়ো ময়না পোষ মানে না। গুহ্যাতিগুহ্য যে পরা-বিদ্যা, যাকে শাস্ত্রে বলে গেছে 'রহস্যমুত্তমম্' তা তো আর যখন তখন যাকে তাকে দেওয়া চলে না। গোঁফ উঠলে আর সে বিদ্যার অধিকারী হবার জো নেই।

পণ্ডিতজী বললেন—"বুঝতে ত পারছ, ব্যাপার বড় কঠিন। সেবার মাদ্রাজে একটি দিব্যি আধার পাওয়া গিয়েছিলো। গুরুজী তাকে শোধন করে লর্ড মৈত্রেয়ের উপযুক্ত করে তুলেছিলেন। লর্ড মৈত্রেয়ও নামবার জন্যে তপঃলোক থেকে এক পা বাড়িয়েছিলেন ; এমন সময় দৈত্য দানবে যে উপদ্রব করে দিলে তা তো আর তোমাদের অবিদিত নেই। অবতারজী ধামা চাপা পড়ে গেলেন আর গুরু মাকে নষ্টপ্রেষ্টিজ উদ্ধারের জন্যে দেশময় দামড়া লাফ ছেড়ে ভারত-উদ্ধার করে বেড়াতে হোলো। কতটা সময় নষ্ট হয়ে গেল একবার দেখ দেখি। তা যদি না হোতো তো এতদিন কোন্ কালে লর্ড মৈত্রেয় এসে বিলেত-লক্ষ্মীর আঁচলের খুঁটে ভারতলক্ষ্মীকে প্রেমের ফাঁসে বেঁধে দিতেন। যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন শুনতে পাচ্ছি গুরুমা অবতারশিপের জন্যে ছত্রিশটী নতুন

ক্যাণ্ডিডেট জোগাড় করেছেন। আরও গুটিকতক চাই। আমি বলেছি—'ভয় নেই, আমি খুঁজে দেবো।' তোমাদের মধ্যে জনকত যদি আমার সঙ্গে সাধনে বসো, তা হলে আমি একবার তোমাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলো মিলিয়ে নিয়ে দেখি যে তোমাদের মধ্যে লর্ড মৈত্রেয় নামতে পারেন কি না। কি বলো?'

আমরা সবাই সাধনে বসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলুম।

পণ্ডিতজী উৎফুল্ল হয়ে বললেন—"হাঁ, এই ত চাই। তোমরা সবাই ঘরের দোর জানালা বন্ধ করে উর্দ্ধমুখ হয়ে হাঁ করে বসো।"

তাই করা হলো।

পণ্ডিতজী উঠে পাঁয়চারি করতে করতে বললেন—"দশ মিনিট পরে যখন দেখবে যে চুলের গোড়া শিড়িং শিড়িং করছে, পায়ের গোড়ালি গুড়ং গুড়ং করছে, আর কাণে রি রি আওয়াজ হচ্চে, তখন বুঝবে যে তোমাদের মধ্যে লর্ড মৈত্রেয় আবির্ভাব হচ্চেন। তাঁকে আর সেই সময় যেতে দিও না। খপ করে দু-হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে নিজের নিজের মুখ বন্ধ করে দেবে।"

আমরা খুব ভক্তিভরে সাধনে বসলুম।

দশ মিনিট পরে চোখ খুলে দেখি পণ্ডিতজী কখন সরে পড়েছেন আর সবাই মুখে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পুরে বসে আছে।

---

(২৭)

ভগবান-ধরা কল।

একটা, দুটো, ক্রমে তিনটে চুরুট পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে উঠলো, কিন্তু inspiration আর সে দিন এলো না। শেষে

বিরক্ত হয়ে "দুত্তোর" বলে কলম ছেড়ে উঠে পড়লুম। কাঁধে একখানা চাদর ফেলে লাঠি গাছটা বগলে নিয়ে পণ্ডিতজীর ঘরের কাছে গিয়ে বললুম-- "চলুন একটু সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করে আসা যাক।"

পণ্ডিতজী তখন দু তিন হাত সম্মুখে ভুঁড়িটিকে বিস্তার করে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড তাকিয়া ঠেস দিয়ে গুণ গুণ করে তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ করছিলেন। আমার আওয়াজ শুনেই বই খানি বন্ধ করে ভুঁড়ির উপর রেখে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি, সাহিত্য-সেবা শেষ হলো?"

একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বললুম—"নাঃ—আজ আর কিছু হবার লক্ষণ দেখলুম না। মা সরস্বতীর দরজায় তিন তিনটে মোটা মোটা ধুপ কাঠি জ্বালিয়ে এক ঘণ্টা উর্দ্ধমুখ হয়ে হাঁ করে বসে রইলুম; কিন্তু দেবীর দরজা খোলার সাড়া শব্দ কিছু পেলুম না। কাজেই ভাবলুম মা সরস্বতীর উপর আর বৃথা অত্যাচারের চেষ্টা না করে গায়ে একটু হাওয়া লাগিয়ে বেড়াই। তিনিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন, আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবো।"

পণ্ডিতজী খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন—"খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছ। দেবতারা অত্যন্ত খামখেয়ালী জাত। কিসে যে তাঁদের অনুগ্রহ হয়, আর কেন যে তাঁরা দরজা বন্ধ করে মুখ ভার করে বসে থাকেন তা মানুষের বাপেরও বোঝবার সাধ্য নেই। "বারে বারে ঠেলতে হবে হয়ত দুয়ার খুলবে না"—এ একেবারে ভুক্ত-ভোগীর প্রাণের কথা। তাই যদি হয়, ত নিতান্ত কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে দরজায় ঠেলাঠেলির কর্ম্মভোগটুকু আর কেন? দরজা যখন খোলবার হয় খুলবে, যখন বন্ধ হবার বন্ধ হবে। এ সরল সত্যটুকু বুঝলে "মেজে ঘসে সাহিত্যিক" হবার দুশ্চেষ্টা থেকে মানুষ বেঁচে যায়, আর মা বীণাপাণিকেও অরসিকের হাতে পড়ে গদাপাণি হয়ে উঠতে হয় না।"

আমার সাহিত্য-সেবার উপর এ রকম প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ-পাতে আমি যে

খুব প্রসন্ন হয়ে উঠলুম তা নয়। পণ্ডিতজীর হাতে রামায়ণ খানার দিকে লক্ষ্য করে বললুম—"ঠিক কথা বলেছেন, পণ্ডিতজী। শুধু মা সরস্বতী কেন, খোদ ভগবান থেকে আরম্ভ করে ভূত পর্য্যন্ত সমস্ত দেবতা, উপদেবতার উপর অত্যাচার করা মানুষের একটা বদ্ অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবে ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র অবতার হয়ে বানরের প্যারেড করিয়ে গিছলেন—আর তাই থেকে আমরা ঠিক করে বসে আছি যে যদি বনের বানর ধরে তাদের লেজ উঁচু করিয়ে প্যারেড করাতে পারি ত স্বয়ং রামচন্দ্র তাদের মাঝখানে এসে নিশ্চয় হাজির হবেন। রামচন্দ্র বেচারী হয় ত আমাদের কীর্ত্তিকলাপ দেখে বৈকুণ্ঠে হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছেন।"

পণ্ডিতজী রামায়ণখানা ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—"ঠিক বলেছিস! আমারও ক' দিন থেকে ঐ কথাই মনে হচ্ছিল। ভগবান যার উপর ভর করেন সে হয়ত নাচে, কাঁদে, হাসে, গায়—কিন্তু ঐ নাচা কাঁদা হাসা গাওয়ার একখানা শাস্ত্র তৈরি করে যদি আমরা বলি যে শাস্ত্রসঙ্গত ভাবে ঐ কাজগুলো করলেই ভগবান এসে কাঁধের উপর ভর করবেন তা হলে ভগবান যে আমাদের আবদার শুনতে বাধ্য হবেন তা ত মনে হয় না। চৈতন্যদেব প্রেমে উন্মত্ত হয়ে নদের মাটীতে গড়াগড়ি দিয়ে গেলেন—কিন্তু এই পাঁচশ বছরে অন্ততঃ পঞ্চাশ লাখ লোক নদের মাটী চষে ফেলেও আর একটা চৈতন্যদেব গড়তে পারলে না। সমাধির সময় মানুষের হাত পা আড়ষ্ট হয়ে, জিভ তালুতে লেগে যায়, কিন্তু তাই বলে জিভ তালুতে লাগিয়ে হাত পা আড়ষ্ট করে বসে থাকলে সমাধি যে হতেই হবে তার ত কোন প্রমাণ পাইনে। বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে তাঁর সাধন প্রণালী চালিয়ে সঙ্ঘ গড়ে গেলেন, কিন্তু সেই সাধনের কলে পড়ে আর একটা লোককেও ত বুদ্ধ হতে দেখলুম না! শঙ্করাচার্য্য ষোল বছর বয়সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে প্রচার করতে লেগে গেলেন।

গেরুয়ার পতাকা উড়লো ; দেশ মঠে মঠে ছেয়ে গেলো ; কামিনী কাঞ্চন ঘরে পড়ে কাঁদতে লাগলো ; লাখ লাখ সাধু "অহং ব্রহ্মাস্মি" হুঙ্কার করতে করতে ব্রহ্মজ্ঞানের তাল ঠুকতে লাগলেন ; সোহহং মন্ত্র জপ করতে করতে কত লোকের গোঁফ দাড়ী পেকে গেল ; কিন্তু দশনামীদের ভিতর আর দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য ত জন্মাল না ! এই সব দেখে শুনেই ত মনে হয় যে ভগবান মানুষের কাছে আসে যায় নিজের খেয়ালে। যাঁরা ভগবানের দেখা পান তাঁরা তাঁদের শিষ্য সেবকদের ভগবান-ধরা ফাঁদ পাতবার কৌশলটা শিখিয়ে যান বটে কিন্তু সে ফাঁদে ভগবান যে ধরা দিয়েছেন ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই।"

পণ্ডিতজীর কথাগুলো শুনে আমারও মনে একটু খট্‌কা লাগলো। আমি বললাম—"তাই তো কর্ত্তা, তুমি যে ভাবিয়ে তুললে! এত দিনের, আমাদের এত সাধের তিলক, মালা, কৌপীন, জটা, গেরুয়া তুমি এক নিশ্বাসে সব উড়িয়ে দিতে চাও?"

পণ্ডিতজী বিরক্ত হয়ে বললেন—"ঐ তোমাদের দোষ! উড়িয়ে দেবার কথা আমি আবার কখন বললুম। প্রাণে সখ থাকে ত তিলক কাট, গেরুয়া উড়াও, জটা ঝোলাও, নাক টিপে ডিগবাজী খাও—কিছুতেই আপত্তি নেই। কিন্তু যখন মনে কর যে তোমাদের সাধন ভজনের কসরতে ভগবান কাবু হয়ে পড়বেন বা তোমাদের বেশ বিন্যাসের ঘটা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে দশ হাত এগিয়ে আসবেন, তখন আমার মখুজ্যেদের সেই পাগলী মেয়েটার কথা মনে পড়ে।"

—"সে আবার কে?"

—"আহা, সেই বিয়ে পাগলী মেয়েটা হে! ভুলে গেছ তাকে? মস্ত বড় কুলীন তার বাপ; কাজেই মেয়ের বয়স যত বাড়তে লাগলো, বরও তত দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলো। পাড়ার মেয়েদের যখন বর আসতো তখন

তারা হাসি মুখে পান চিবিয়ে বেড়াতো। তাই দেখে পাগলীও ঘরে ঢুকে একগাল পান মুখে পুরে দন্তবিচ্ছেদ করে বেড়াতে লাগলো। তার যুক্তিটা হচ্চে এই, যে বর এলে যখন মেয়েরা হাসে আর পান খায়, তখন সেও যদি হাসে আর পান খায় ত তার বর আসবে না কেন? তিলক, গেরুয়ার যুক্তিটাও অনেকটা সেই রকম।"

আমি অবাক হয়ে হাঁ করে রইলুম। আমাদের হলধর খুড়ো এতক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে চেয়ারে বসে তামাক টানছিলেন। তিনি এইবার হুঁকোটা রেখে দিয়ে বললেন—"একেই বলে ঘোর কলি! যোগ, যাগ. সাধন, ভজন আজ পণ্ডিতজীর হাতে পড়ে বিয়ে-পাগলীর পান চিবান হয়ে দাঁড়াল! শাস্তর টাস্তর পড়েও লোকে যে এমন উচ্ছন্ন যায় তা জানতুম না। বলি, সেকালের মুনি ঋষিরা যে দশ হাজার বছর ধরে হেঁটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ হয়ে তপস্যা করতেন, যদি তাঁরা ভগবান না পেতেন, ত শুধু ইয়ারকি করবার জন্যে তাঁরা ঠ্যাং লট্‌কে ঝুলতেন না কি?"

পণ্ডিতজী হেসে বললেন—"খুড়ো, চোটো না। ঋষিরা যদি ঊর্দ্ধপদ হয়ে ঝুলে থাকেন তাহলে কি পেয়েছিলেন তা নিজেই পরীক্ষা করে দেখতে পার। দশঘণ্টা যদি ঝুলতে পার ত মুখে রক্ত উঠে ব্রহ্মপদ ত পাবেই; তা ছাড়া পরজন্মে তোমার বাদুড় বা চামচিকে সিদ্ধি হবেই হবে।"

হলধর খুড়োর মুখখানা রাগে লাল হবার চেষ্টা করতে করতে শেষে ক্ষোভে কালো হয়ে উঠলো।

—"এমন নাস্তিকের পাল্লায়ও মানুষ পড়ে।"—বলে তিনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লেন। চেয়ারখানা খালি হয়ে গেছে দেখে আমি তাতে অম্লানবদনে বসে পড়ে পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করলুম—"না, না হাসি ঠাট্টা নয়। সত্যই কি আপনি মনে করেন মানুষের ভগবানকে পাবার চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা?"

পণ্ডিতজী মুখখানা গম্ভীর করে উত্তর দিলেন—"বাবা, ভগবান কি এইটুকু যে মানুষ তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরবে আর লাড্ডু পেঁড়ার মত কামড়ে কামড়ে খাবে? নিজের চেষ্টায় মানুষ ভগবানকে কখনো পায়নি, তবে ভগবান মানুষকে অনেকবার পেয়েছে। যারা বাইরে থেকে তামাসা দেখে তারা মনে করে মানুষ ভগবানকে পাচ্ছে কিন্তু আসল কথাটা ঠিক উল্টো। যতদিন লম্ফঝম্ফ ততদিন অষ্টরম্ভা। কিন্তু আজ এই পর্য্যন্তই থাক। হলধর খুড়ো চোটে কোথায় বেরিয়ে পড়লো দেখো। শেষ-কালে ঋষি হবার আশায় ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বয়সে কোথাও ঠ্যাং লটকে না ঝুলতে থাকে।"

(২৮)

মেয়ের বিয়ে।

সন্ধ্যার সময় দিব্যি ফুটফুটে চাঁদ উঠেছে। ছাদ একেবারে জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে। কবিকঙ্কণ চন্দ্রাহতের মত চাঁদের দিকে চাইতে চাইতে গান ধরে দিলে—

"এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভাল।"

পণ্ডিতজী চক্ষু বুজে থেলো হুঁকায় টান দিচ্ছিলেন। হঠাৎ গদাইয়ের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি গদাই, তোরও ঐ মত নাকি?"

গদাই এতক্ষণ মরা ছাগলের মত চক্ষু করে ভাবাবিষ্ট হয়ে গান শুনছিল। পণ্ডিতজীর প্রশ্ন শুনে তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে—"আজ্ঞে, না, মরবার সখ্ আমার একদম নেই। এই সুমুখে শীতকাল। ভাল করে কপি কলাইসুটির ডালনা আর একবার খাবার আগে স্বর্গে হাওয়া বদলাতে

যাবার প্রবৃত্তি আমার মোটেই হয় না। চাঁদের আলো দেখে কবিদের মরবার কথা মনে উঠতে পারে, আমার ত শুধু মনে হয় বিয়ে করবার কথা।"

—"ও একই জিনিস, বাবা, একই জিনিস!"—বলে হলধর খুড়ো কোণ থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন।—"বিয়ে করা" মানেই পৈতৃক প্রাণটি খোয়ানো। তার চেয়ে গোটা কতক স্বদেশী বক্তৃতা ঝেড়ে দশ বিশ বচ্ছর জেল খাটা ঢের ভাল। জানই ত Once a married man, always a married man। ফুর্ত্তি করে সাত পাক দেবার সময় লোকে যদি টের পেত যে মরণ পর্য্যন্ত ঐ ঘুরপাকই খেতে হবে, তাহলে তুমি ভেবেছ কি ঐ কুকর্ম্ম কেউ করতে যেত? সেকালে স্বদেশীর যুগে আমরা উনপঞ্চাশ জন বীরপুরুষ স্বামীজীর গ্রন্থাবলী হাতে করে প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলুম যে ভারত উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের মুখদর্শন কোরবো না।"

কবিকঙ্কণ বলে উঠল—বল কি খুড়ো! তোমরা যে এক এক জন ভীষ্মদেবের মাসতুতো ভাই ছিলে, দেখতে পাচ্ছি।"

হলধর খুড়োর বিছিন্ন দশন পংক্তি জ্যোৎস্নায় একবার চিকমিকিয়ে উঠল। কিন্তু তিনি রাগটা সামলে নিয়ে বললেন,—"বাবা, মহিষাসুর মর্দ্দিনীদের পাল্লায় যদি পড়তে, ত বুঝতে পারতে কত ধানে কত চাল। ভীষ্মদেব প্রতিজ্ঞা করে যে বিশেষ ঠকেছিলেন বলে ত মনে হয় না। তা চুলোয় যাক ভীষ্মদেব। আমাদের সেই উনপঞ্চাশ জন বীরপুরুষের কথাই বলি। সরকার বাহাদুরের অতিথিশালায় যাঁরা আট দশ বৎসর ধানে ভাতে খেয়ে কাটিয়ে দিয়ে এলেন, তাঁদের বাধ্য হয়ে প্রতিজ্ঞাটা রক্ষা করতেই হয়েছিল। আজ তাঁরা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে তুড়ি মেরে বেড়াচ্ছেন। তা ছাড়া বাকি সকলকার আমারই মত অবস্থা। কারও

বা তিনিটী পুত্তুর চারটি কন্যে, কারও বা চারটি কন্যে তিনটী পুত্তুর। আরে, বাবা, সরকারী জেলের ত শেষ আছে, আর এই ঘরের জেল যে একেবারে অফুরন্ত।"

হলধর খুড়ো বক্তৃতা শেষ করে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। গদাই জিজ্ঞাসা ক লো—"কি খুড়ো, আজ খুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি হয়েছে না কি?"

খুড়ো মাথাটা নীচু করেই উত্তর দিলেন—"আরে, ঝগড়া হলে ত মিটে যেত। যা হয়েছে তা মরবার আগে আর মেটবার নয়!"

—"কি হয়েছে কি, বলই না!"

—"বলবো আর কি ছাই! হয়েছে মেয়ে। আজ সকাল বেলা আমার শ্বশুরের বেটা সম্বন্ধী এই সুসমাচার পাঠিয়েছেন যে তাঁর ভগ্নী আর একটী কন্যারত্ন প্রসব করেছেন। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এই একগণ্ডা পুরো হলো।"

হোঃ হোঃ হোঃ করে হাসির ধুম পড়ে গেল। হর্‌রা একটু থামলে হলধর বল্‌লেন—"তোমাদের ত হাসতে হাসতে দাঁতে খিল ধরে যাচ্চে, আর এ দিকে আমার যে জিভ বেরিয়ে পড়চে। বড় মেয়েটা এই বারো উৎরে তেরোয় পড়েচে! পাড়া পড়শীরা যাঁরা ডেকে কখনো জিজ্ঞাসা করেন নি যে ভাতের উপর কাঁচকলা ভাতে জুটছে কি না, তাঁরাও এসে দিনে তিন শ বার অযাচিত ভাবে উপদেশ দিয়ে যাচ্চেন যে মেয়েকে আর আইবড় রাখা ভাল দেখাচ্চে না। এদিকে একটা অকাল-কুষ্মাণ্ড পাত্রের দরও অন্ততঃ দু হাজার টাকা, যা বাপের বয়সে কখনো এক সঙ্গে দেখিনি।. মেয়ের বিয়ে দিই কি করে?"

পণ্ডিতজী এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এইবার বলে উঠলেন—"বিয়ে দিও না।"

হলধর খুড়ো মাথা চুলকুতে চুলকুতে বললেন—"তুমি ত বিয়ে দিও না বলে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলে ; এদিকে আমার যে জাত কুল যায়।"

পণ্ডিতজী এইবার দু হাত নাড়া দিয়ে বললেন—"মরিরে তোমার জাতকুল নিয়ে। বারো বছরের মেয়ের বিয়ে না দিলে যদি জাতকুল যায়, ত অমন জাতকুল চুলোয় যাক্। মেয়েকে বড় করে ছেড়ে দাও, তার পর তার খুসী হয় বিয়ে করুক, না খুসী হয় আইবড় থাকুক। যার বিয়ে করবার দরকার হবে সে নিজের ভাবনা নিজে ভাববে।"

হলধর খুড়ো খানিকটা হাঁ করে রইলেন। তার পর বললেন—"ভাল রে ভাল! মেয়েগুলো বিয়ে করবে না ত খাবে কি করে?"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"তুমিও যেমন করে খাচ্ছ, তারাও তেমনি করে খাবে। ভগবান দুটো হাত দিয়েছেন, খাটবে আর খাবে। বিয়েটা কি মেয়েদের পেশা যে ঐ করে তাদের খেতে হবে? তারা ত আর কুলীন বামুন নয়!"

খুড়ো এইবার চোটে গেলেন। বললেন—"তোমার যত সব অনাসৃষ্টি কথা! ভদ্দর লোকের মেয়ে কি বাজারে মোট বইতে যাবে, না মাথায় সামলা এঁটে ওকালতি করতে যাবে?"

কবিকঙ্কণ উকিল মানুষ। সে বলে উঠলো—"মেয়েরা মোট বইতে চায় ত তা করুক গে, কিন্তু তাদের ওকালতিতে আমার ঘোরতর আপত্তি। প্রথমতঃ কথায় তাদের এঁটে উঠতে পারা যাবে না, আর যদিও পারা যায় ত যুক্তিতে না পারলে তারা শেষে কেঁদে আমাদের হারিয়ে দেবে। জজ সাহেবেরও মাথা ঠিক থাকবে না।"

পণ্ডিতজী হেসে বললেন—"না হে না, তোমার ভয় নেই। মোট বওয়া আর ওকালতি করা ছাড়া আরও অনেক কাজ আছে যা মেয়েরা খুব ভালই পারে। তোমরা ঠিক করে রেখেছ যে তারা বৎসরান্তর

তোমাদের একটী বংশধর প্রসব করবে, আর বংশধরের বাপকে ভাত রেঁধে খাওয়াবে। কিন্তু চিরদিন তারা তা নিয়ে তুষ্ট থাকবে না। পায়রার মত তাদের খোপে পুরে রেখে দিয়েচ, আর ভাবছ যে তারা দানা খেয়ে আর ডিম পেড়ে বেশ আছে। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি চোখ খুলে দেখ ত বুঝতে পারবে যে বিনা পয়সার বাঁদী হয়ে থাকার চেয়ে মোট বোয়ে খাওয়াও ভাল।

গদাই এতক্ষণ চিৎ হয়ে পড়েছিল। সে এইবার তার নবীন গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বলে উঠলো :—"থাক্, থাক্, হাটের মাঝে আর হাঁড়ি ভেঙ্গে কাজ নেই। একটা মাঝামাঝি রাস্তা ধরাই ভাল। স্বয়ম্বর প্রথাটা আবার ফিরিয়ে আন্‌লে কেমন হয়?"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"তোর তা'হলে আর চন্দ্রাহত হয়ে পড়ে থাকতে হয় না। একটা দাঁড়াবার গাছতলা জুটতে পারে।"

গদাই দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—"দেখা যাক, মাসখানেক সবুর করে। স্বরাজটা হয়ে গেলে হয় ত একটা স্বয়ম্বরী আইন পাশ হতে পারে।"

---

(২৯)

স্বয়ম্বরা মেয়ে।

হলধর খুড়ো সন্ধ্যা বেলা কোমরে গামছা বেঁধে এসে খবর দিলেন যে, অনেক ভেবে চিন্তে তিনি মেয়েকে স্বয়ম্বরা করাই স্থির করেছেন। গদাই পকেট থেকে রুমালখানা বার করে মাথার উপর ঘুরিয়ে "হুর্‌রে"

বলে চীৎকার করে উঠলো। বললে—"এই ত চাই, এ হলো একেবারে সনাতন প্রথায় সমাজ সংস্কার! 'বিপ্র হোক, ক্ষত্র হোক, বৈশ্য শূদ্র জাতি, যে বিন্ধিবে সে লভিবে কৃষ্ণা গুণবতী।' হাঁা খুড়ো, লক্ষ্য টক্ষ্য বেঁধবার কিছু ব্যবস্থা করেছ নাকি?"

খুড়ো বললেন—"না রে না; লক্ষ্যও বিঁধতে হবে না, হরধনুভঙ্গও করতে হবে না। ওগুলো হলো স্বয়ম্বর by courtesy। একালে যেমন মা বাপ পাশকরা ছেলে দেখে মেয়ে দেয়, সেকালে তেমনি ক্ষত্রিয়েরা লড়ায়ে পালোয়ান দেখে বিয়ে দিত। মা বাপই যদি বর বেছে দিলে, ত মেয়েদের স্বয়ম্বরা হওয়া হলো কৈ? আমার মেয়ের যা হবে তা ও রকম মেকি স্বয়ম্বর নয়; একেবারে খাঁটি জিনিষ।"

কবিকঙ্কণ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার পটলচেরা চোখ দুটিতে একটা কবিত্ব মাখান ঢুলুঢুলু ভাব আনবার চেষ্টা করছিল। সে এইবার সুরটাকে বেশ মোলায়েম করে বললে—"একবার দাও ত খুড়ো সেই খাঁটি জিনিষটির একটু সটীক বিবরণ। বাঙ্গালীর হৃদয় মরুভূমিতে একটা Romanceএর ধারা ছুটে যাক। বাঙ্গালীর হৃদয়-গোবরে একবার শালুক ফুটুক।"

খুড়ো বললেন—"ও কাজটা মেয়ের বাপের নয়। Romanceএর সৃষ্টি তুমি স্বয়ম্বরের পরে করো। ইচ্ছা করলে কালিদাসকে টেক্কা দিয়ে একখানা নতুন রঘুবংশও লিখে ফেলতে পারো। তবে একেবারে সর্ব্ববর্ণ-সমন্বয় করবার দুঃসাহসও আমার নেই। বুদ্ধ, কবীর, নানক, নিত্যানন্দ থেকে কেশব সেন পর্য্যন্ত যে কাজ করতে গিয়ে ফেল হয়েছেন সে কাজ যে আমার মেয়ের বিয়ের উপলক্ষে হয়ে যাবে এ আশা আমার নেই। আমি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আর 'প্রজাপতি' অফিসে চিঠি লিখে পণপ্রথা বিরোধী অকৃতদার সমস্ত ব্রাহ্মণ সন্তানকে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত

হতে নিমন্ত্রণ করেছি। তোমরাও সবাই কাল সকালে উপস্থিত থেকো। তারপর তোমাদের অদৃষ্ট আর আমার মেয়ের বরাত।”

খুড়ো বক্তৃতা শেষ করে চলে গেলেন। গদাই তাড়াতাড়ি একখানা আরসির সুমুখে মুখখানা সোজা করে, বাঁকা করে হেলিয়ে দুলিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। কবিকঙ্কণ উর্দ্ধনেত্রে শিষ দিতে দিতে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করে দিল। ক্যাবলাকান্ত Dyeing Cleaningএ কাপড় কাচতে দিয়েছিল; ধাঁ করে তা আনবার জন্যে ছুটে বেরিয়ে পড়লো।

সে রাতটা তো কোন রকমে কেটে গেল। তার পরদিন সকালে উঠে দেখি সবাই স্নান করে, টেরি কেটে, ধোপদোরস্ত কামিজ গায়ে দিয়ে ফিট্‌ফাট্ হয়ে সেজে গুজে স্বয়ম্বর সভায় যাবার উদ্যোগ করচেন। আমিও তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে ক্ষৌরকর্ম্মটা সেরে নিয়ে তাঁদের পিছু পিছু বেরিয়ে পড়লুম।

খুড়োর বাড়ী গিয়ে দেখি, হাঁ একটা স্বয়ম্বর সভা বটে! উঠানের মাঝখানে সামিয়ানা খাটান হয়েছে। খুঁটিগুলো রংবেরঙের পাতালতা দিয়ে ঘেরা; চারিদিকে গাঁদাফুলের মালা। পাশের একটা দিক মেয়েদের জন্য চিক দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে থেকে এরই মধ্যে গল্পের ফিস্ ফিস্ শব্দ আর চুড়ির টুং টাং আওয়াজ শোনা যাচ্চে। অপর দিকে দর্শকদের বসবার জায়গা; আর পূর্ব্বদিকে মুখ করে ঘোষেদের বাড়ী থেকে ধার করা খান পঁচিশেক চেয়ার অর্দ্ধবৃত্তাকারে সাজান। সে চেয়ারগুলো বরপদ প্রার্থীদের জন্য রিজার্ভ্ড।

আটটা না বাজতে বাজতে একে একে, দুয়ে দুয়ে, চারে চারে পণপ্রথাবিরোধী ব্রাহ্মণ সন্তানেরা হাজির হতে আরম্ভ করলেন। খুড়ো মহাসমাদরে তাঁদের অভ্যর্থনা করে চেয়ারে বসিয়ে দিতে লাগলেন। ঘোষেদের রামা মালি এসে তাঁদের গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দিলে।

খুড়োর ন বছরের তৃতীয় কন্যাটী তার দিদির বিয়ের আশায় উৎফুল্ল হয়ে এক রেকাবি পান নিয়ে এসে বর-সভার শোভা বর্দ্ধন করতে লাগল।

নটা বাজবার পূর্ব্বেই বরেদের চেয়ারগুলি ভরে গেল। "কেউ বা দিব্যি গৌর বরণ, কেউ বা দিব্যি কালো"। অধিকাংশেরই হালফ্যাসানে গোঁফ দাড়ি কামান। ফ্রেঞ্চ কাট, জার্ম্মান কাট, সেক্সপিরিয়ান কাট দাড়িরও একেবারে অসদ্ভাব নেই। চুল কারও বা দশ আনা ছয় আনা, কারও বা একদম কোচম্যানী ছাঁট। অধিকাংশেরই নাকে চশমা। কেবল এককোণে—আরে মলো, ওটা কে? পণ্ডিতজী না? বরসভায় একখানা চেয়ার জুড়ে বুড়ো কি মনে করে? বুড়ো শালিকের ঘাড়ে আবার রোঁয়া উঠলো নাকি?

ঠিক সাড়ে নটার সময় কন্যাকে সভায় উপস্থিত করা হলো। খুড়ো বলছিল মেয়েটী বারো উৎরে তেরোয় পড়েছে; কিন্তু দেখলে আরও বছর দুয়ের বড় বলেই মনে হয়। বরেদের মধ্যে আগে একটা চঞ্চল চাহুনি, পরে গম্ভীর হবার একটা আড়ষ্ট-চেষ্টা দেখা গেল। আমাদের দাদা মশায় সম্পর্কের ভটচায্যি মশায় একখানা নাম ধাম ও গুণাবলী সম্বলিত তালিকা হাতে করে বরেদের পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন:—

১নং অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—বয়সে সাড়ে বত্রিশ। অঙ্কশাস্ত্রে আধ নম্বরের জন্যে বি, এ ফেল করেছিলেন। তা না হলে এতদিন একটা ডেপুটী হতে পারতেন। আপাততঃ শা ওয়ালেশের বাড়ী ৩৫ টাকা—

মেয়েটী তাঁর সুমুখ থেকে সরে গিয়ে দ্বিতীয় বরপদপ্রার্থীর সামনে এসে দাঁড়াল। ভটচায্যি মশায়ও তালিকাটা একবার দেখে নিয়ে আরম্ভ করলেন—

২নং দিগম্বর কাঞ্জিলাল—বয়সে ২৪। মেডিক্যাল কলেজে ঘুষ দেবার টাকা না থাকায় ক্যাম্বেলে পড়েছেন। আশা আছে যে—

মেয়েটী বরের আশা ভরসার কথা শোনবার আগেই পা বাড়িয়ে দাঁড়াল। তৃতীয় বরের স্মুখের দাঁত দুটী উঁচু দেখে মেয়েটী মৃদু হাস্যে জানিয়ে দিলে যে দাঁত উঁচু বরে তার বিষম আপত্তি। চতুর্থ বর ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, তার উপর বেজায় মোটা। মেয়েটী তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে এমনি ভাবে চাইলে যে বর বেচারা লজ্জায় রক্তবর্ণ হবার বৃথা চেষ্টা করে শেষে অধোবদন হয়ে পড়লো। ভটচাযি্য মশায় তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন।—

"৫নং রাইবিলাস মুখোপাধ্যায়—অত্যন্ত সদ্বংশ, ফুলের মুকুটি, কানাই ছোট ঠাকুরের সন্তান। ৬ মাস হলো কাঙ্গালপুরে মুন্সেফি করচেন। সনাতন ধর্ম্মের উপর প্রগাঢ় আস্থা। প্রাণায়াম সাধন করতে করতে নাক একটু বেঁকে গেছে বটে —"

আর অধিক বিবরণ দেবার দরকার হলো না। ভটচাযি্য মশায়ও তাঁর স্মুখ থেকে সরে পড়লেন।

৬ নং রমণীমোহন ঘোষাল ওরফে কবিকঙ্কণ—ইনি স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ কবি। এঁর কৃপাদৃষ্টি না হলে মাসিকের সম্পাদকদের নাকের জলে চোখের জলে একাকার হয়ে যায়। এঁর "মলয়লতিকা" বার হবার পর "চর্পটপঞ্জরিকা" পত্রিকায়—

মলয়লতিকার কি গতি হলো তা জানাবার জন্যে অপেক্ষা না করে মেয়েটী একেবারে সাত কদম এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। ভটচাযি্য মশায় ফের আরম্ভ করলেন :—

১০ নং প্রেমতোষ চট্টরাজ—"প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের ছেলে। এঁর ঠাকুর দাদার আমলে পূজার সময় বাইনাচে যা টাকা খরচ হতো তাতে"—

তাতে যে কি অঘটন ঘটতো তা আর জানা গেল না। একে একে

সব বরই ফেল হয়ে যেতে লাগলো। হলধর খুড়োর মুখ ক্রমে শুকিয়ে উঠতে আরম্ভ হলো। এত রকম বেরকমের ছেলে!—তবু মেয়ের যে কাউকে পছন্দ হয় না। শেষে সব আয়োজন কি পণ্ড হবে নাকি?

পণ্ডিতজী বালাপোস খানি মুড়ি দিয়ে এককোণে এতক্ষণ বসে ছিলেন। তাঁর কাছাকাছি হবামাত্র তিনি দাঁড়িয়ে উঠে ভট্টচায্যি মশায়কে বল্লেন—"আপনি একটু চুপ করুন। আমার বিবরণ আমি নিজেই দিচ্চি"। মেয়েও থম্‌কে পণ্ডিতজীর সুমুখে দাঁড়াল। পণ্ডিতজী মেয়েটীর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—

"দেখগো লক্ষ্মী, আমায় যদি বিয়ে করো; ত তোমায় চুড়ি দেবো, বালা দেবো, হার দেবো, গোট দেবো, চিক দেবো, বাজু দেবো, মাথায় সিঁথি দেবো, আর চাও ত ক্রাউনও দেবো—"

মেয়েটী ফিক্ করে হেসে ফেল্‌লে। পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"শুধু তাই নয়। হপ্তায় তুদিন থিয়েটার দেখতে নিয়ে যাব; আর সকালে বিকালে এই এত বড় মাছের মুড়ো দিয়ে ভাত খেতে দেবো"

চিকের আড়াল থেকে একটা চাপা হাসি শোনা গেল। মেয়েটীও হাসতে হাসতে পণ্ডিতজীর গলায় মালা পরিয়ে দিলে। এই সময় চিকের ভিতরকার অবলাদের কণ্ঠ ভেদ করে যে উলুধ্বনি উঠলো তাতে বেশ বোঝা গেল যে বর-নির্ব্বাচনের সঙ্গে অবলাকুলের বিলক্ষণ সহানুভূতি আছে।

বরেদের মধ্যে কেউ হাসতে লাগলো, কেউ ম্রিয়মাণ হলো। গদাই আস্তিন গুটিয়ে, গোঁফ পাকিয়ে পণ্ডিতজীর সামনে খাড়া হয়ে বল্‌লে—"আমরা এতগুলো সুপাত্র থাকতে তুমি বুড়ো যে এই কন্যারত্ন নিয়ে যাবে তা আমরা প্রাণ থাকতে সহ্য করবো না। অতএব রণং দেহি।"

পণ্ডিতজী তাঁর বিরাট বরবপু ঈষৎ দুলিয়ে গদাইএর অঙ্গে ধাক্কা মেরে

বললেন—"এই লেহি"। গদাই পপাত ধরণীতলে। পণ্ডিতজী হাসতে হাসতে বললেন—"ওরে বালক, বসুন্ধরা আর স্ত্রীরত্ন উভয়ই বীরভোগ্যা। শাস্ত্রের মর্ম্ম ত তোরা বুঝলি নে!"

---

(৩০)

না পড়ে পণ্ডিত।

পণ্ডিতজীর কেমন বদ অভ্যাস তাঁর ছেলেটাকে ইস্কুলে পাঠশালে পাঠাবেন না। ছেলেটা ষাঁড়ের মত লাফিয়ে লাফিয়ে পাড়া মাথায় করে বেড়াচ্চে। তার জ্বালায় গাছে পেয়ারা থাকবার জো নেই, লাউ মাচায় খুঁটি থাকবার জো নেই, খেজুর গাছে কলসী থাকবার জো নেই। বই হাতে দিলে তার ঘুম পায়, না হয় মাথা ধরে, না হয় পেট কামড়ায়। পণ্ডিতজীকে এক দিন অনুনয় বিনয় করে বললুম—"দেখুন আপনার ছেলে মুখ্যু হবে, এটা দেখতে শুনতে বড় খারাপ। ছেলেটার একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।" পণ্ডিতজী অম্লান বদনে উত্তর দিলেন—"লেখা পড়াটা আমাদের বংশে কেমন সয় না। আমরা সবাই না পড়ে পণ্ডিত। আমার বাবা যখন ছেলে বেলায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতেন তখন দাদা মশায় তাঁর শুভঙ্করীতে বিদ্যা পরীক্ষা করবার জন্যে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আচ্ছা বল দেখি, এক একটা শিয়ালের যদি এক একটা লেজ হয়, তো ৫০টা শিয়ালের ক'টা লেজ হবে?' বাবা ধাঁ করে উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে, আমরা মন কষা পর্য্যন্ত শিখেছি, এখনও লেজ কষা শিখিনি।' দাদা মশায় রেগে বাবার কাণ মলে দিতে গিছলেন বলে ঠাকুরমা রাগ করে তিন দিন ভাত খান নি। শেষে রাগ যখন পড়লো, তখন তিনি হুকুম

জাহির করলেন—'আমার ছেলে মুখ্যু হয় ত পণ্ডিতি করে খাবে। তা বলে ওর গায়ে কেউ হাত তুলো না।' সেই হুকুম আমাদের বংশে বাহাল রয়েছে। আমরা যখন মুখ্যু হই তখন পণ্ডিতি করে খাই।"

ডেঁপোমিতে পণ্ডিতজীকে পারবার জো নেই। আমি বললুম—"না, না, ঠাট্টা তামাসা নয়। নন্-কো-অপারেশনের ধুম লাগা অবধি ছেলেটা যে বই টই টেনে ফেলে দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় সর্দ্দারি করে বেড়াচ্ছে, মা সরস্বতীর মুখ দর্শন করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে বসেছে—এর ফলাফল তো আপনার ভাবা উচিত। বামুনের ঘরের ছেলে মুখ্যু হলেই গোঁয়ার হয়ে দাঁড়ায়। শেষে যে রকম দিন কাল পড়েছে, কোন্ দিন না একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়ে বসে!"

পণ্ডিতজী হাসতে হাসতে বললেন—"ছেলে বেলায় আমিও যখন তাল গাছ থেকে কাকের বাচ্ছা পেড়ে পেড়ে বেড়াতুম তখন বাবার কাছে আমার নামে ঐ রকম নালিশ হয়েছিল। বাবার টোলের পোড়োরা আমায় ধরতে গিয়েছিল; তাদের মাথায় তাল ফেলে দেওয়া ছাড়া আমি গাছের উপর থেকে এমন দুই একটা কুকার্য্য করে দিয়েছিলুম যে তাদের স্নান করে শুদ্ধ হওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। কিন্তু বাবা আমার লেজ কষাটা বোধ হয় বুড়ো বয়সেও ভাল করে শিখতে পারেন নি; তাই আমার লেজ কসে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। আমিও ঠিক সেই রকম করে পিতৃঋণ শোধ করেছি। আর তা ছাড়া আর একটা কথা কি জানিস্? - তোদের শিশুশিক্ষার সুশীল ও সুবোধ বালকের উপর আমার অরুচি জন্মে গেছে। আমার ছেলে যদি সুশীল ও সুবোধ হয় তা হলে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করা ছাড়া আর আমার গত্যন্তর নেই।"

বুড়ো বলে কিগো? আমি বল্লুম—"ছেলে না হয় সুবোধ না হয়ে দস্যিই হলো, কিন্তু তার লেখাপড়া শিখতে আপত্তি কি?"

পণ্ডিতজী বললেন—"ঐটি হবার জো নেই, বাবা। তোমাদের বিদ্যা-দায়িনী যন্তোর এমনি কায়দা করে তৈরি যে যিনি বাঘের মত হালুম হালুম করতে করতে ঐ যন্তোরের মধ্যে ঢুকবেন, তাঁকেও বার হবার সময় মেনি বেড়ালের মত মিউ মিউ করতে হবে। যত বড় দস্যি ছেলেই হোক না কেন, বিদ্যের চাপে যদি মারা না পড়ে তবু তাকে পঙ্গু হয়ে থাকতেই হবে। সরকারী শান্তিরক্ষার এমন উপায় আর নেই। ৫০০ পুলিস ইন্সপেকটার যে কাজ না করতে পারে, পাঁচটা ইস্কুল মাষ্টারে তা অনায়াসে করে দিচ্চে। আমাদের দেশে যদি জবরদস্তি বিদ্যে শেখাবার ব্যবস্থা হয় তা হলে পুলিশের থানা রাখবার আর দরকার হবে না। ন্যাংড়া নুলো, কাণা, বোঁচা হয়ে যে সব ছেলে পিলে কলেজ থেকে বার হবে তাদের দিয়ে সরকারী শান্তি সভা স্থাপন করা ছাড়া আর কোন কাজ হবার আশা নেই।"

আমার বড় রাগ হলো। বল্লুম—"আপনিও এক কালে কলেজে হাওয়া খেতে যেতেন।"

পণ্ডিতজী বললেন—"হাঁ, কুসঙ্গে পড়ে কিছুদিন ও কার্য্য করেছিলুম বটে। কিন্তু সে পাপ আমার অনেকদিন হলো খণ্ডে গেছে। যতদিন পেটে কলেজী বিদ্যের কণামাত্র ছিল, ততদিন পেট ফাঁপতো, হাই উঠতো, চলতে গেলে ঠ্যাং বেঁকে যেতো। তরপর একদিন গোলদিঘির ধারে গিয়ে সিনেট হলের দিকে মুখ করে মা সরস্বতীর উদ্দেশে গললগ্নীকৃতবস্ত্র হয়ে বললুম—'মা, পেটে যা ছিটে ফোঁটা দিয়েছ তা সুদশুদ্ধ ফিরিয়ে নাও, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ডিসপেপসিয়াটিও নিয়ে নাও।'

মায়ের মেজাজ তখন শরিফ ছিল বোধ হয়। মা আমার প্রার্থনা শুনে বলেছিলেন—"তথাস্তু'। সেই অবধি আর ওদিক মাড়াইনে। আমার কেমন ধারণা হয়ে গেছে যে কলেজের ছেলেরা একেবারে গয়লার বাছুর হয়ে যায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"সে আবার কি ?

পণ্ডিতজী বললেন—"আহা ! সে গল্পটা জানিস নে ? একটা গয়লার ঘরের বাছুর আর একটা বামুনের ঘরের বাছুর একদিন এক জায়গায় ছাড়া পেয়েছিল। গয়লা টেনে দুধ দোয় ; কাজে কাজেই তার বাছুরটা একটু কাহিল আর বামুনের শরীরে একটু দয়ামায়া ছিল ; কাজেই তার বাছুরটি ওরি মধ্যে একটু হৃষ্টপুষ্ট। বামুনের বাছুর গয়লার বাছুরকে বল্‌লে—"ভাই একটু খেলা করবি ?" গয়লার বাছুর বল্‌লে—কোরবো। বামুনের বাছুরের বেশ একটু স্ফর্ত্তি হলো। সে বললে—'তবে আয় ভাই খানিকটা ছুটোছুটি করে বেড়াই।' গয়লার বাছুরের ছুটোছুটি করবার সমর্থ্য নেই। সে প্রস্তাব করে বসলো—'না ভাই ছুটোছুটিতে কাজ নেই। আয় দেখি কে কত শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়তে পারে !' —তোমার কলেজের ছেলেদেরও ঠিক ঐ দশা। বিশ্ববিদ্যালয় তাদের এমনি চুষে ছেড়ে দেয় যে সারা জীবন কে কত লেজ নাড়তে পারে তাই দেখা ছাড়া আর কিছু তাদের দিয়ে হয় না।"

কথাটা নির্ব্বিবাদে মেনে নিতে আমি রাজি ছিলাম না। কাজে-কাজেই পণ্ডিতজীকে বললুম—"আর একদিন ও কথাটার বিচার করা যাবে। আজ চলুন একটু বেড়িয়ে আসি।"

---

(৩১)

আর কত দিন ?

পণ্ডিতজী সে দিন সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। রাস্তায় যে রকম জুজুর ভয়, আমরা ভেবেছিলুম বুড়োকে আবার দিন কতকের জন্যে

আলিপুরে হাওয়া খেতে না যেতে হয়। মাথাপাগলা মানুষ, শান্তিরক্ষার বহর দেখে কখন সার্জেণ্ট বাহাদুরদের প্রেমালিঙ্গন করে বসবে তা তো বলা যায় না! আর সার্জেণ্টরাও যে রকম প্রেমিক পুরুষ, একবার যদি আমাদের পণ্ডিতজীকে ভালবেসে ফেলে, তো সে প্রেমের বন্ধন টেনে ছেঁড়া দায় হবে। কিছুদিন আলিপুরে রেখে দিয়ে তাঁর সেবাশুশ্রূষা না করে আর তাঁকে ছাড়বে না। আটটা বেজে গেলো; নটা বাজে বাজে। গদাইকে বল্‌ছিলাম—"যা, বাবা, একবার না হয় বড়বাজারের থানাটা পর্য্যন্ত দেখে আয়, শেষে বুড়ো কি সত্যি সত্যিই—।" কথা আর আমার শেষ করতে হলো না। চটি জুতোর ফট্ ফট্ আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখি পণ্ডিতজীর নবজলধরশ্যাম-বপু সুমুখেই দণ্ডায়মান! মুখের এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্য্যন্ত হাসিতে ভরে গেছে। চোখের কোণে একটা উদ্দাম আনন্দ।

পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করে পণ্ডিতজী গদাইএর নাকের উপর ছুঁড়ে মেরে বললেন—"নিয়ে আয় আজ ভেঁটকি মাছের মুড়ো; আর সের কতক রসগোল্লা। আজ আমি তোদের খাওয়াব। আর কাল মঙ্গলবার, চল কালীঘাটে; আমি মায়ের কাছে জোড়া পাঁঠা পুজো মেনেছিলুম। দিয়ে আসতে হবে। বেটী অনেকদিন থেকে জিভ বার করে বসে আছে!"

ব্যাপার কি? গদাই আমার মুখের দিকে চাইতেই পণ্ডিতজী তাকে এক ধাক্কা মেরে বললেন—"আরে হনুমান, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি? লঙ্কায় আগুন লেগেছে দেখছিস্ নে? এইবার জয় রাম বলে মার লাফ।"

গদাই ধাক্কা খেয়ে রসগোল্লা আন্‌তে চলে গেল। আমি আর বাক্যব্যয় না করে পণ্ডিতজীর জন্যে একছিলিম তামাক সাজতে বসে গেলুম। অতীত

অভিজ্ঞতার ফলে আমি এটুকু বেশ জানতুম যে তামাকটুকু পুড়ে যতক্ষণ না ছাই হবে ততক্ষণ আর এই ভক্তিতত্ত্বের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করা চলবে না।

তামাকটুকু যখন বেশ ধরে এলো, তখন পণ্ডিতজীর অর্দ্ধনিমীলিত চোখের দিকে লক্ষ্য করে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"সত্যি সত্যিই কালীঘাটে পূজো মানা আছে না কি?"

পণ্ডিতজীর হাত থেকে গড়গড়ার নলটা খসে পড়ে গেল। তিনি তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন—"বলিস্ কিরে? আমরা ছাপ্পান্ন পুরুষ ধরে শাক্ত; আর আজ আমি কপালে সাদা চন্দনের ফোঁটা কাটি বলে তোরা কি মনে করিস, যে, আমার পিতৃপুরুষদত্ত রক্তটাও সাদা হয়ে গেছে? রিফর্মের মালপো খেয়ে যারা ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে, সে বংশে আমার জন্ম নয়। গাজনের আওয়াজ শুনলেই আমার চড়কে পিঠ এখনো চড়চড় করে উঠে। অনেকদিন আগে, তোরা যখন ছেলে মানুষ, দেশের লোক যখন ঘুমুচ্চে তখন আমি তিনদিন হত্যা দিয়ে কালীঘাটে পড়েছিলুম। মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—'মা, আর কতদিন? কবে তুমি জাগবে?' মা সেদিন বলেছিলেন—'তোদের মেয়েরা যে দিন জাগবে, আমিও সেদিন জাগবো।' তারপর মা আমার চোখের সামনে ভবিষ্যতের যে দৃশ্য দেখিয়েছিলেন, আজ কলকাতার রাস্তায় আমি সে দৃশ্য দেখে এসেছি। ওদের বিসর্জ্জনের বাজনা আমি নিজের কাণে শুনে এসেছি। তোরা যাই বলিস না কেন, কলিতে কালীই জাগ্রত দেবতা। বেটী পূজোর সময় বলি খায় বটে, কিন্তু বেইমানী করে না।"

আমি ভালমানুষের মত জিজ্ঞাসা করলুম—"কি দেখেছিলে পণ্ডিতজী?

পণ্ডিতজী বললেন—"যা দেখেছিলাম তার কতকটা চোখের সামনে তোরাও দেখছিস। আর যেটুকু বাকি আছে সেটুকু আরও সাত বছর

ধরে তোরা দেখবি। দেখেছিলাম আর কি! মায়ের রণচণ্ডী মূর্ত্তি। ভারতের এক শেষ থেকে আর এক শেষ পর্য্যন্ত মা প্রলয় বহ্নি জ্বেলে দিয়েছেন। উন্মত্ত জনসঙ্ঘ বন্দুক, কামান, গোলাগুলি তুচ্ছ করে ভৈরব নিনাদে দিগন্ত মুখরিত করে তুলেছে। ঠিক গান্ধীর মত টুপি পরা একজন সেই জনসঙ্ঘকে শান্ত করবার চেষ্টায় তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কোথা থেকে একটা বন্দুকের গুলি এসে তাঁর গায়ে লাগলো। বাস্—শান্তির শেষ চিহ্ন মুছে গেলো। মহাত্মা নিজের জীবন আহুতি দিয়ে দিলেন। সারা আকাশ তাঁর রক্তের আভায় রাঙ্গা হয়ে উঠলো।"

আমার গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগলো। মনে হতে লাগলো—এসব কি সত্যি না খেয়াল?

পণ্ডিতজী আমার মুখের দিকে খাণিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে থেকে বললেন—"ভাবছিস এ সব আমার মাথার খেয়াল। তবে যাক্ ও সব কথা। হয়ত বা আফিমের ঝোঁকেই ওসব খেয়াল দেখেছিলুম! কিন্তু আজ কেবলি দুহাত তুলে লাট কর্জন আর জেনেরাল ডায়রকে আশীর্ব্বাদ করতে ইচ্ছা হচ্চে। আলমগীর বাদসার পর অমন বন্ধু আর আমাদের হয় নি।"

হাসি চাপা আমার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠলো। আলমগীর বাদশা যে আমাদের এতবড় বন্ধু এ কথাটা জানতুম না। ঐতিহাসিকেরা তা লিখতে ভুলে গেছে।

পণ্ডিতজী বললেন—"মুখে আগুন তোর ঐতিহাসিকদের। আকবর বাদশাকে তাদের ভারি মনে ধরে। আঃ খেলে কচুপোড়া! দেশে যদি আর দু একটা আকবর বাদশা থাকতো তা হলে রাজপুতেরাও গোলাম মেরে যেত আর গুরু গোবিন্দও জন্মাত না, শিবাজীও জন্মাত না। শরীরে বিষ ঢুকুলে যেমন শরীরটা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে যায়, আকবরের

কাছে মিঠে গোলামী শিখে দেশটারও সেই দুর্দ্দশা হয়ে আসছিল। আর আলমগীর!—হ্যাঁ, খাঁটি তাতার বাচ্ছা বটে! তিন দিনে দেশটাকে বুঝিয়ে দিলে যে গোলামের সুখশান্তি সব ফক্কিকারী। আলমগীর যদি না জন্মাত, ত গুরু নানকের চেলারা আজ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের বৈষ্ণবদের মত হরিনামের ঝুলি নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। ডালহৌসি, কর্জন, ডায়ার ঠিক ঐ আলমগীরের বংশধর। মরা জাতকে বাঁচাবার সিদ্ধমন্ত্র ওদের কাছে। আজ আবার ঠিক ঐ পুরোণো হাওয়া বয়েছে; তাই স্ফূর্ত্তিতে আমার প্রাণ লাফিয়ে উঠছে।"

ঠিক সেই সময় রসগোল্লার ঠোঙ্গা হাতে করে গদাই ফিরে এল। আমি বল্লুম—"আজ রাজনীতি চর্চ্চাটা তা হলে থাক। রসগোল্লা-চর্চ্চা তার চেয়ে ঢের বেশী উপাদেয়।"

---

(৩২)

গদায়ের বৈরাগ্য

স্বয়ম্বর সভা থেকে ফিরে এসে গদাই সেই যে ঘরের ভিতর ঢুকলো, দুদিন আর তার দেখা পাওয়া গেল না। তিন দিনের দিন সকাল বেলা পণ্ডিতজী বললেন—"ওরে দেখ্‌না তোরা একবার ছেলেটার কি হলো! শেষে কি ছোঁড়া মনের দুঃখে একটা কাণ্ড মাণ্ড করে বস্‌বে?"

কবিকঙ্কণ হাই তুলতে তুলতে বল্‌লে—"কাণ্ড আর কি করবে? দিন কত আগে হোলে গেরুয়া ছুবিয়ে বিবাগী হয়ে যেতো; কিন্তু গেরুয়ার romance আজ কাল অনেকটা কেটে গেছে। বিবেকানন্দ মারা

যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে গেরুয়াও মারা পড়েছে। এখন ছেলেরা শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে স্বামীজীর ছবিকে আরতি করেই কাজ সারে। গেরুয়ার দিকে বড় একটা ঘেঁসে না।”

রাইবিলাস বললে—“সেদিন আমি দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছিলুম ; মনে হলো যেন গদাই কি লিখ্‌ছে !”

কবিকঙ্কণ লাফিয়ে উঠলো। বললে—“ঐরে সর্ব্বনাশ করেছে! আমার ব্যবসা বুঝি বা মারে! ওর মত অবস্থায় পড়লে আমি একখানা মহাকাব্য, অন্ততঃ একখানা গীতিকাব্য ত শেষ করে ফেলতুম। বিরহের বেগে inspired হয়ে, হয় ত সে ঐ কার্য্যই আরম্ভ করে দিয়েছে।

ক্যাবলাকান্ত এই সময় ঘরে এসে মুচিপাড়ার থানায় একদল স্বদেশী ভলন্টিয়ার গ্রেপ্তারের খপর দিলে।

রাইবিলাস যেন চম্‌কে উঠলো। সে বললে—“গদাইকে যা লিখতে দেখেছিলাম তা হয় ত তার Last Will and Testament”

পণ্ডিতজী বললেন—“ভাল রে ভাল ; গদাই শুধু শুধু উইল লিখতে যাবে কেন ? সে ত আর ষোলবছরী খুকি নয় যে বিয়ে হলো না বলে মনের দুঃখে কেরোসিনে পুড়ে মরবে ?”

রাইবিলাস বললে—“ওগো না, না, কেরোসিনে পুড়ে বা আফিম খেয়ে তাকে কেউ মরতে বলছে না। সে হয় ত উইল টুইল করে ভলন্টিয়ারদের দলে যোগ দেবে।”

ক্যাবলাকান্ত হেসে ফেললে। সে বললে—“ভলন্টিয়ার হলেই হয় ছ মাস জেলে দেবে নয় ত রাত্তিরে ধরে নিয়ে গিয়ে ধাপার মাঠে ছেড়ে দেবে। তার জন্যে ত উইল করবার দরকার নেই ; বরং জেল আজকাল যা হয়ে উঠেছে তাকে শ্বশুর বাড়ী বল্লেই হয়।”

পণ্ডিতজী বললেন—“তা হলে বিরহের বস্তা হাল্কা করবার জন্যে ঐ

দিকে যাওয়াই স্বাভাবিক। যাই হোক, তার ঘরে গিয়ে একবার খোঁজটাই করা যাক।

পণ্ডিতজী উঠে পড়লেন। আমরাও সবাই সঙ্গে সঙ্গে উঠলুম। গদায়ের দরজার কাছে গিয়ে পণ্ডিতজী স্বরটা যথাসম্ভব মিষ্ট করে ডাকলেন —"গদাই, ও গদাই, দাদা আমার, দরজাটা খোল ত।"

গদায়ের কোনই সাড়া শব্দ নেই।

কবিকঙ্কণ দরজার চোখ দিয়ে দেখে চুপি চুপি বললে—"আরে! গদাই বিরহের জ্বালা ঠাণ্ডা করবার জন্যে শুয়ে শুয়ে কমলালেবু খাচ্চে।"

পণ্ডিতজী বললেন—"চুপ কর তুই। গদাই ছেলে মানুষ হলে কি হয়, জ্ঞান ওর টন্ টন্ করচে। বৈরাগ্য, বিরহ প্রভৃতি অধ্যাত্মিক ব্যাধির মূল যে পাকস্থলীতে বা শরীরের অন্য কোন কেন্দ্রে, তা ও বিলক্ষণই জানে। ছেলে বেলায় আমার যখন ঐ সব ব্যাধির প্রকোপ হতো, তখন আমি নবীন ময়রার দোকান থেকে গোটাকত রসগোল্লা আনিয়ে টপাটপ মুখে ফেলে দিতুম, আর কিছুকালের জন্যে ব্যাধির উপশম হয়ে যেতো। শরীরের সঙ্গে আত্মার যে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তা বরং তোরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Experimental Psychology'র প্রোফেসরকে জিজ্ঞাসা করে আসিস। তিনি যে একখানা "এনছাইক্লোপিডিয়া ডিভিনা" অর্থাৎ "ভাগবত বিশ্বকোষ" লিখেছেন তা দেখেছিস ত? তাতে পরমাত্মা, জীবাত্মা ভূতাত্মা, প্রেতাত্মা, মহাত্মা, সংঘাত্মা প্রভৃতি আত্মাপুরুষের যত রকমফের আছে, তাঁদের শরীরের কোন্ কোন্ কেন্দ্রের সঙ্গে কি রকম সম্বন্ধ, তার একেবারে সটীক বর্ণনা দেওয়া আছে। গদায়ের যে সমস্ত লক্ষণ দেখছি তা 'ভাগবত বিশ্বকোষের' 'মহাত্মা' অধ্যায়ে বর্ণনা করা আছে। আমার মনে হচ্চে গদাই আহার বিহার সংযত করে 'মহাত্মা' হবার চেষ্টা করছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—'তাহলে এর antidoteটা আপনি বাৎলে দিন'।

পণ্ডিতজী বললেন—"মহাত্মার antidote হচ্চে সংঘাত্মা। বিশ্বকোষের 'ভাগবত অর্থশাস্ত্র' অধ্যায়ে তুমি সংঘাত্মার বিবরণ দেখতে পাবে। মূলাধার আর স্বাধিষ্ঠান চক্রেই প্রধানতঃ সংঘাত্মার স্থিতি। ঐ দুটো চক্রে ধ্যান করলেই ভাগবত অর্থশাস্ত্র তোমার দখলে আসবে; আর তুমি বিরাট আধ্যাত্মিক বাণিজ্য গড়বার ছত্রিশ রকম কৌশল শিখবে; পাইকারী বা খুচরা ভাগবত ব্যবসা চালাবারও কোন বাধা থাকবে না। ফলে তুমি পায়ের উপর পা দিয়ে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে সংঘাত্মা হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে! আমি দেখছি যে গদাইকে এই সংঘাত্মা মন্ত্রে দীক্ষিত না করলে তার আর রক্ষা নেই।"

গদাই এই সময় খট্ করে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বললে—"তথাস্তু।"

---

(৩৩)

শ্যাম না এল

ভোর বেলা লেপখানাকে বেশ করে জড়িয়ে ধরে কবিকঙ্কণ গান ধরে দিয়েছে—

সখি শ্যাম না এল
অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী
বুঝি বিভাবরী পোহাল।

মিঠে মিঠে শীতের সঙ্গে মিঠে মিঠে সুর মিশে বেশ একটা নেশার

আমেজ সৃষ্টি করে আনছিল, এমন সময় রাইবিলাস লেপের ভিতর থেকে চার ইঞ্চি লম্বা নাকটি বার করে বলে উঠলো—"থামাও বাবা, কাঁদুনি থামাও। কাল চার গণ্ডা পয়সা খরচ করে চুল ছাঁটিয়ে এসেছ, আর আজ রাত কাটতে না কাটতে তোমার কবরী একেবারে শিথিল হয়ে গেল? দোহাই কবিকঙ্কণ, তোমার আধ্যাত্মিক বিরহকে খানিকটা লেপ চাপা দিয়ে আমাদের আর একটু ঘুমুতে দাও।"

কবিকঙ্কণের গান থেমে গেল। সে বিরক্ত হয়ে বললে—"না, তোদের মত বে-রসিকের সঙ্গ ত্যাগ না করলে আর আমার মুক্তি নেই। সকালবেলা কোথায় একটু নাম কীর্ত্তন করবো, তাও তোদের জ্বালায় হবার জো নেই।"

"চোটো না, কবিকঙ্কণ, চোটো না." বলে রাইবিলাস গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলো। এই non-violenceএর দিনে মনে মনে রাগ করাও একটা ভীষণ পাপ। তা ছাড়া ভক্তি-শাস্ত্র আলোচনা করবারও ত একটা সময় অসময় আছে। ভগবান ত আর আমাদের মত মেসে পড়ে থাকেন না। বৈকুণ্ঠধাম ত আমাদের মেসের মত লক্ষ্মীছাড়া জায়গা নয়! এই যে শীতকালের দিন ভোরবেলা তুমি ভগবানকে নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করেছ, এটা একটা ভক্তির বাজে খরচ। ভগবান বেচারা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন, তোমার অত সাধের মিঠে কাঁদুনি হয়ত তাঁর কাণেও পৌছুচ্চে না। আর যদি শুনতে পেয়ে তোমায় বর দেবার জন্যে তিনি বিছানা ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়েন, তা হলে মা লক্ষ্মী তোমার উপর মনে মনে কি রকম চটে যাবেন তা বুঝতেই পারছ! ভগবানকে চটিয়ে বরং পার পাবে, কিন্তু মা লক্ষ্মী যদি চটেন ত তোমার ভিটেয় একেবারে ঘুঘু চরিয়ে ছেড়ে দেবেন।"

পণ্ডিতজী এতক্ষণ তুমুল নাসিকাগর্জ্জন করে সুষুপ্তির আনন্দ উপভোগ করছিলেন। রাইবিলাসের বক্তৃতার ধ্বনি যখন তাঁর নাসিকার

ধ্বনিকে পরাজিত করে দিলে, তখন তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হলো। রাইবিলাসের শেষ কথাগুলো বোধ হয় তাঁর কাণে গিয়েছিল। তিনি নিদ্রালসকণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন—"ঠিক বলেছিস, রাইবিলেস, আধ্যাত্মিক Common senseটা তোর বেশ টনটনে'। ছেলেবেলা থেকে আমি দেখে আসছি, যারা মা লক্ষ্মীকে চটিয়ে ভগবানকে ধরে টানাটানি করে তাদের 'কোমরে কৌপীন জোটে না, গায়ে ভস্ম শিরে জটা।' ঐ জন্যেই ত কবিকঙ্কণ আজ সাত বছর ধরে আলিপুর কোর্টে হাওয়া খেতে যাচ্চে, তবু সাতটি পয়সার মুখ দেখতে পেয়েছে কি না সন্দেহ।"

কবিকঙ্কণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বল্‌লে—"পণ্ডিতজী, আপনি শেষে ঐ ছোঁড়াদের দলে গিয়ে জুটলেন!"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"কি করবো, বাবা, আধ্যাত্মিক মোসাহেব সঙ্ঘে ত আর আমি নাম লেখাই নি যে তত্ত্বজ্ঞানের লেবেল এঁটে মোটা মোটা মিথ্যা কথা পাচার করবো। চোখের সামনে দেখতে পাচ্চি যে কাণ টানলেই যেমন মাথা আসে তেমনি মা লক্ষ্মীকে তুষ্ট করতে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে ভগবানেরও তুষ্টি। এই দেখো না, ইউরোপের ব্যাপার। ওরা হপ্তায় ছ'দিন মা লক্ষ্মীর সেবা করে, আর রবিবারে গির্জ্জায় গিয়ে একবার ভগবানকে সেলাম করে আসে। আর আমাদের দেশে দিন নেই, রাত নেই, আমরা 'প্রভু হে, দয়াল হে' বলে কেঁদে কেঁদে মরচি। কিন্তু প্রভু যে আমাদের উপর তার জন্যে ওদের চেয়ে বিশেষ কিছু খুসী হয়েছেন তার ত প্রমাণ পাই নে। ওরা তবু পেট ভরে খেতে পায়, আর আমরা পেটের জ্বালাটা আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ দিয়ে শীতল করি।"

কবিকঙ্কণ বলে উঠ্‌লো—"না পণ্ডিতজী; এ কথাটা আপনার মনে লাগছে না। শাস্ত্রে বলে গেছে ভগবানের পূজো করলেই লক্ষ্মীর পূজো করা হয়; ভগবানের তুষ্টিতেই লক্ষ্মীর তুষ্ট।'

পণ্ডিতজী বললেন—হ্যাঁ, গো কর্ত্তা, হাঁ। কিন্তু নাকি সুরে কান্নাটাই যে ভগবানকে তুষ্ট করবার প্রকৃষ্ট পন্থা এ কথা শাস্ত্র কোথাও বলে নি। শাস্ত্র বরং উল্টো কথাই বলে গেছে যে বৈরিভাবে সাধন করলে তিন জন্মে যা পাওয়া যায়, খোসামোদ করে পেতে গেলে তাতে সাতজন্ম লাগে। মডারেটদের স্থান কোথাও নেই—না আধ্যাত্মিক জগতে, না আধিভৌতিক জগতে।

আধ্যাত্মিক গবেষণা ক্রমে আধিভৌতিকের দিকে গড়িয়ে আসছে দেখে গদাই স্ফূর্ত্তির চোটে বলে ফেললে—"হায় রে, এ তত্ত্ব যদি আমাদের আধিভৌতিক নেতারা বুঝতেন, তা হলে আজ কি তাঁদের কবিকঙ্কণের মত সুর করে গাইতে হতো—

সখি, স্বরাজ না এল
অবশ অঙ্গ শিথিল কচ্ছ
ঐ ডিসেম্বর ফুরাল।"

তার সাধের কবিতার এই রকম বেয়াড়া parody শুনে কবিকঙ্কণের পিত্ত জ্বলে গেল। সে ধাঁ করে লেপ খানা ফেলে দিয়ে একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি ধরে গদায়ের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে বললে—"থামা তোর কবিতা, পাজি ; নৈলে তোর গলা টিপে মেরে ফেলবো।"

গদাই লেপের ভিতর ঢুকে গিয়ে কীর্ত্তনের সুরে গাইতে লাগলো—

"আমি মরি তাহে ক্ষতি নাই হে
তোমার non-violent নামে যে কলঙ্ক হবে
তোমার স্বরাজ যে আরও পিছিয়ে যাবে।"

কবিকঙ্কণ ক্রুদ্ধস্বরে বললে—"তোর মত পাষণ্ড থাকতে স্বরাজের কোন আশা নেই। আগে আমি তোর গলা টিপে মারবো, তার পর দরকার হয় ত দিন তিনেক উপোস করে প্রায়শ্চিত্ত করবো।"

গজ-কচ্ছপ যুদ্ধের পুনরভিনয় হবার জোগাড় দেখে সবাই হুড়মুড় করে লেপ ছেড়ে উঠে পড়লুম। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক সব গবেষণাই সে দিনকার মত মাঠে মারা গেল।

---

(৩৪)

নদের চাঁদ

"আরে, নদেরচাঁদ হঠাৎ ভূতলে উদয় যে!"—বলে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পণ্ডিতজী নদেরচাঁদকে জাপটে ধরলেন।

নদেরচাঁদ মুসলমানের ছেলে। আসল নাম সেখ ইসমাইল। দিব্যি ফুটফুটে গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় সুপুরুষ। নদে জেলায় বাড়ী বলে পণ্ডিতজী তার নাম রেখেছিলেন নদেরচাঁদ।

জাপটা জাপটি শেষ হবার পর পণ্ডিতজী তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন—"তোর আবার এ কি হলো? তোর সেই ঝালঝুপ্পা, সতের গণ্ডা বোতাম আঁটা আলখেল্লা কোথা গেল? তোর সে লাল তুর্কি ফেজ কই? তোর চাঁচর চিকণ বাবরীর এমন দশা করলে কে? আজ তোর পায়ে চটি জুতো, আর গায়ে খদ্দরের চাদর—এ আবার তোর কি বেশ?"

নদেরচাঁদ খুব খানিকটা প্রাণখোলা হাসি হো হো করে হেসে নিয়ে বললে—

"আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি,
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ
আমি সহসা আমারে চিনেছি আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।

এবার আমদাবাদে গিয়ে আমার তুর্কি হবার সখ মিটেছে। তাই ফেজটি আমার খসে গেছে। এই আক্কেল হয়েছে যে আমি মুসলমান বটে, কিন্তু বাঙ্গালী, তুর্কি নই।"

পণ্ডিতজী তার মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে রইলেন।

নদেরচাঁদ পণ্ডিতজীকে চুপ করে চেয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—"এনভার পাশাকে স্বাধীন ভারতের সেনাপতি করবার প্রস্তাবটা শোনেন নি?"

পণ্ডিতজী বললেন—"ওঃ? তাই বটে! হাঁ শুনেছি বৈ কি। কিন্তু তা শুনে ত ফেজটা আরও শক্ত করে মাথায় আঁটা উচিত ছিল। তুই সেটা খুললি কি ভেবে?"

নদেরচাঁদ বললে—"আমার পাশে একজন পাঠান বসেছিল; সে বললে—'কাবুলের দরবার থেকে চেয়ে পাঠালে কাবুলের আমীরও একজন সেনাপতি পাঠিয়ে দিতে পারেন।' কাবুলীওয়ালা এসে ভারতের সেনাপতি হবে—কথাটা আমার একটা বিরাট ঠাট্টা বলে মনে হলো। অথচ তুর্কী যদি সেনাপতি হতে পারে ত কাবুলীই বা কি দোষ করলে? তুর্কিও মুসলমান, কাবুলীও মুসলমান। তুর্কিদের সঙ্গে কখনও আমার মেলামেশা হয় নি; কিন্তু কাবুলী যে কি চিজ্ তা বিলক্ষণই জানি। যে ভারতে কাব্লীওয়ালাকে সেনাপতি করতে হবে, সে ভারত কি রকম স্বাধীন তা আমি ভেবে উঠতে পারছি নে। তারপর কাবুলীর মাথার দিকে চেয়ে দেখলুম যে তুর্কি ফেজের নাম গন্ধও নেই। তখন আমার মনে হলো কাবুলীও ত মুসলমান; কিন্তু সে ত তুর্কি সাজতে যায় না। আচার, ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদে সে নিজের দেশের কায়দা কানুন বজায় রাখে; কিন্তু আমরা মুসলমান হলেই নিজের দেশের যা কিছু সব ছেড়ে দিয়ে তুর্কি ফেজ মাথায় তুলি কেন? আরবী, ইরানী, তাতার,

আফগান্ সবাই মুসলমান—কিন্তু কেউ নিজের দেশের পোষাক ছেড়ে অপরের পোষাক পর্‌তে যায় না। আমরাই বা তা করবো কেন?"

পণ্ডিতজী হাস্‌তে হ্‌ সতে বল্‌লেন—"আমাদের দেশী খ্রীষ্টানেরা যে জন্যে পাঁতলুন পরে ফিরিঙ্গি সাজতে যায়, তোমরাও সেই জন্যে ফেজ মাথায় দিয়ে তুর্কি সাজো।"

নদেরচাঁদ বললে—"কথাটা অপ্রিয় হলেও ঠিক। বিদেশীর কাছে থেকে যারা ধর্ম্ম পেয়েছে তারা ধর্ম্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী আচার ব্যবহারও নিয়ে নেয়। তারা ভাবে ওগুলো না হলে ধর্ম্মটা খোলতাই হয় না। অথচ ধর্ম্মের সঙ্গে এ সমস্ত বাইরের আচারের এমন ত কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই। আজ যদি আপনি চীনেম্যানের কাছ থেকে কংফুংজের ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তা হলে আপনাকে আরসুলা বা টিকটিকির চাটনি যে কেন খেতে হবে, তা ত বুঝতে পারছি নে। সাত হাত নলের ভিতর দিয়ে চণ্ডুর ধোঁয়া না টান্‌লে কংফুংজ চোটে যাবেন—এই বা কেমন আবদার?"

টিকটিকির চাটনির কথা শুনে হলধর খুড়ো মুখ সিঁটকে বললে—"আরে থুঃ।"

পণ্ডিতজী বললেন—"খুড়ো হে, অত নাক সিঁটকো না। স্বরাজের যে রকম পরস্মৈপদী আয়োজন, তাতে অদৃষ্টে কি যে ঘটবে তা বলা যায় না। মুসলমানেরা যদি বলেন যে স্বাধীন ভারতের সেনাপতিকে তুর্কিস্থান থেকে আমদানি করতে হবে, তা হলে চাটগাঁয়ের বৌদ্ধ মগেরা আর ব্রহ্মদেশের ফুঙ্গিরাও ঠিক করতে পারেন যে, একজন চীনে বা জাপানী জাঁদরেল না হলে তাঁদের চলবে না। হিন্দুরা যে রকম উদ্ভট সাত্ত্বিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা বেগতিক দেখলেই পদ্মাসনে ধ্যানস্থ হয়ে তুরীয় লোকের চর্চ্চা করতে আরম্ভ করে দেবে। তখন সুলতান মামুদ আসবেন কাউণ্ট

ওকুমাকে তাড়াবার জন্যে, আর কাউণ্ট ওকুমা আসছেন স্বলতান মামুদকে তাড়াবার জন্যে। দুজনেই আমাদের শুভার্থী; সুতরাং আমাদের একটা গতি না হওয়া পর্য্যন্ত দুজনকেই কোস্তাকুস্তি করতে হবে। আর কার গুঁতো বেশী মিষ্টি তা পরীক্ষা করবার আমাদের যথেষ্ট অবসর মিলবে। কাউণ্ট ওকুমা যদি হাওয়া বদ্‌লাবার জন্যে দিন কতক এ দেশে থেকে যান তা হলে বরাতের জোরে টিকটিকির চাটনি জুটেও যেতে পারে। শেষে বলতে হবে—

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে
কাল হলো তাঁতির এঁড়ে গরু কিনে।

বিদেশী এঁড়ে গরু কেনবার জন্যে আর ঘরের তাঁত বিক্রি করা কেন? নিজেদের যদি মর্দ্দানি না থাকে, ত পরের মর্দ্দানি ধার করে আর কত কাল চলবে?"

হলধর খুড়ো মাথা চুলকুতে চুলকুতে বললেন—"তাই তো, পণ্ডিতজী, তুমি ভাবিয়ে তুললে যে! ঘুরে ফিরে সেই বিদেশী বঁধুর প্রেমে যদি পড়তে হয়, তা হলে জেনেরাল ডায়ার আর দোষ করলে কি? তার চেয়ে আমি বলি কি জনকত মডারেট আর ফিরিঙ্গিকে ধরে একদিন চুণোগলিতে স্বরাজ ঘোষণা করিয়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে লাট রিডিংকে বড়লাট আর লাট লিটনকে বাংলার লাট নির্ব্বাচন করে ফেল। এক বৃন্তে রাজভক্তি আর স্বরাজ দুই এক সঙ্গে ফুটে উঠ্‌বে।

(৩৫)

হলধর খুড়োর অহিংসা

হলধর খুড়ো আহারাদি করে ওঠবার সময় গদাইকে হুকুম করলেন—“ওরে একবার পাঁজি খানা দেখ ত! আজ চতুর্দ্দশী পড়েছে বলে মনে হচ্চে; তা হলে তো আমিষ-ভোজন আজ নিষিদ্ধ। তোরা যে এক রকম জোর করেই গলদা চিংড়ির ডালনা খাইয়ে দিয়ে আমার ধর্ম্ম নষ্ট করে দিলি, এতে পরকালে তোদের কি অবস্থা হবে তা একবার ভেবে দেখেছিস?”

গদাই তাড়াতাড়ি পাঁজির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললে—“না, খুড়ো, চতুর্দ্দশী পড়তে এখনো তিন অনুপল, আড়াই বিপল বাকি। সুতরাং আপনার ধর্ম্মটা খুব প্রাণে প্রাণে বেঁচে গেছে। আর তা ছাড়া চিংড়ি মাছ ত খুব সাত্ত্বিক আহার; আমিষের মধ্যেই গণ্য নয়। দেখেছেন ত চিংড়ি মাছের খোসা ছাড়ালেই একেবারে অমল ধবল দিব্য কান্তি বেরিয়ে পড়ে। যা শ্বেতবর্ণ তা যে সাত্ত্বিক, এ একেবারে শাস্ত্রের কথা।”

খুড়ো ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন—“হাঁ, তা বটে, তা বটে! তবু দেখিস্ বাপু, আহার বিহারের ব্যবস্থাগুলো তোরা একটু সাবধান হয়ে করিস। দেখিস্ যেন আমার সাত্ত্বিকতা না নষ্ট হয়ে যায়। দেশ-কালের অবস্থা বুঝে আজকাল আমি কায়মনোবাক্যে অহিংসা প্র্যাকটিস করছি তা ত জানিস। রাত্রে মশা ছারপোকার জ্বালায় ঘুম হয় না, কিন্তু ভয়ে মারতে পারি নে, পাছে মনে হিংসাবৃত্তি ঢুকে যায়। একবার ছারপোকা মারতে আরম্ভ করলে শেষে কি করতে কি করে ফেলবো তা ত বলা যায় না!”

গদাই বিনীত ভাবে বললে—“না খুড়ো, সে ভয় নেই। তোমার

শরীরের গ্রন্থি সাত্ত্বিকতার প্রভাবে যে রকম শিথিল হয়ে এসেছে তাতে মশার অদৃষ্টে মৃত্যু লেখা না থাকলে সে আর তোমার হাতে মারা পড়বে না। তুমি মারতে গেলে সে হাসতে হাসতে উড়ে চলে যাবে।”

খুড়ো খুব অনাসক্ত ভাবে একটা হাই তুলতে তুলতে বললেন—অহিংসা-সিদ্ধির লক্ষণই হচ্চে তাই।”

গদাই জোড়হস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—“আচ্ছা, খুড়ো তা হলে আমাদের মত রাজসিক জীবগুলোর কি গতি হবে? রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হলে যদি মশাগুলোকে সাত্ত্বিক ভাবে ধরে আস্তে আস্তে তাদের কাণ মলে ছেড়ে দেওয়া যায় তা হলেও কি ধর্ম্মে পতিত হবার ভয় আছে?”

খুড়ো বললেন—“বড় কঠিন কথা, গদাই; বড় কঠিন কথা জিজ্ঞাসা করেছ। ও সম্বন্ধে অহিংসা-সংহিতায় কোন অনুশাসন দেখতে পাওয়া যাচ্চে না। আসল কথা হচ্চে কি জান—মশা হলেন কৃষ্ণের জীব। সুতরাং তিনি যখন লীলাচ্ছলে তোমার অঙ্গে হুল ফোটাতে আরম্ভ করবেন, তখন তুমি সেই মশার অন্তর্যামী ভগবানকে প্রার্থনা দ্বারা তোমার দুঃখের কাহিনী জানিয়ে দিতে পার। খুব আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে যদি এ কাজ করো তা হলে একদিন না একদিন মশা তোমার দুঃখে কাতর হয়ে অন্যত্র উড়ে যাবেন। তা না করে তুমি যদি সরাসরি ব্যবস্থা করে মশার হাত থেকে উদ্ধার পেতে চাও, তা হলে বুঝতে হবে যে মশার হৃদবিহারী ভগবানের উপর তোমার শ্রদ্ধাভক্তি নেই; অর্থাৎ তুমি নাস্তিক; আর তোমার ব্যবহার হলো petulant আর vindictive.”

গদাই কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে—“না, না, ও রকম ভীষণ অপবাদ আমায় দেবেন না। আপনি হলেন ভগবানের প্রাইভেট সেক্রেটারি। সুতরাং আপনি যদি বলেন যে ভেড়ার দুঃখে বাঘের চোখ জলে ভেসে যাবে, বা মাছের শোকে বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করবে'—তা সে কথা

প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ হলেও আমি প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করবো, আর কেউ যদি বিশ্বাস করতে না চায় ত তার গলার কণ্ঠী ছিঁড়ে দেবো। আমি সুধু এই কথা জিজ্ঞাসা করছিলুম যে মশার অন্তর্যামী ভগবান সাড়া দিতে যদি একটু বিলম্ব করেন তা হলে মশা মশায়ের নাকটা বা কাণটা টেনে দিলে ভগবানের একটু শীঘ্র সাড়া দেবার সুবিধা হবে কি না।”

খুড়ো গদাইয়ের বিনয়ে প্রসন্ন হয়ে বল্লেন—“যদি দেখো মশার ভগবান সাড়া দেবার আগেই ম্যালেরিয়া সাড়া দিতে আরম্ভ করেছে তখন না হয় মশাগুলোকে বস্তায় পুরে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিও। বাংলাদেশের যা কিছু, সব সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেবার খোলা হুকুম ত পাওয়াই গেছে।”

গদাই হাত জোড় করে বললে—“ধন্য, খুড়ো, তুমিই ধন্য। তোমার মীমাংসা শুনে আমার মলিন বুদ্ধি চক্‌চকে হয়ে উঠলো। যদি অভয় দাও, ত আর দুই একটা সন্দেহ ভঞ্জন করে নিই।”

হলধর খুড়ো স্মিতবদনে বললেন—“বলো।”

গদাই জিজ্ঞাসা করলে—“রামায়ণ মহাভারতে অবতার পুরুষদের হিংসা বৃত্তি সম্বন্ধে যে সব অকথা কুকথা শুন্‌তে পাই, ওগুলো কি সত্যি? রামচন্দ্র নাকি একলক্ষ পুত্র আর সওয়ালক্ষ নাতি সমেত রাবণ রাজার প্রতি অতি vindictive ব্যবহার করেছিলেন; আর সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাকি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছিলেন আর অসুরদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছিলেন যা ঠিক অহিংস নয়?”

খুড়ো উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌লেন—“তুই ও সেকেলে রামায়ণ মহাভারতগুলো পুড়িয়ে ফেলে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দে। জানিস ত, বাল্মীকি মুনি আগে ছিল একটা গুণ্ডা। রামায়ণ লেখবার সময়ও তার গুণ্ডামি বুদ্ধি ছাঁড়ে নি, তাই রামচরিত্রে সে অমন কলঙ্ক দিয়ে গেছে।

আসল গুজরাতী রামায়ণের আমি যখন বাংলা অনুবাদ বার করবো, তখন তুই তা পড়ে দেখিস। একটা সোজা কথা তোরা ভেবে দেখ্‌না যে রামচন্দ্র যদি রাবণের বংশ লোপাট করেই দিয়ে গিয়ে থাকেন তা হলে তুনিয়ায় আবার এত রাক্ষস জন্মাল কোথা থেকে? আর শ্রীকৃষ্ণ রক্তপাতও করেন নি, অস্ত্র ধারণও করেন নি। রথের চাকাটা ত আর Arms Actএর মধ্যে আসে না! আসল যা খাঁটি রামায়ণ আর মহাভারত তা আমি তোদের আর একদিন শুনিয়ে দেবো। আজ এখন যা। আমি একটু ঘুমুই।"

---

(৩৬)

সাত্ত্বিকতার সহজ পন্থা

কি হলো পণ্ডিতজীর, কে জানে? চোরিচোরার তুঃসংবাদ শুনে অবধি সেই যে তিনি তাঁর চামচিকে-বিনিন্দিত অনন্তশয্যা আঁকড়ে হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছেন, এই তিন দিন হলো আর তাঁর নড়ন চড়ন নেই। ক্রমে খড়মের উপর আঙ্গুলের দাগের মত তার শ্রীঅঙ্গের ছাপ মাথার বালিসে আর বিছানার তোষকে engraved হয়ে উঠলো, ঘরে এক ইঞ্চি পুরু ধুলো জমা হলো; মাকড়শারা সুযোগ পেয়ে তাঁর টিকি থেকে দেওয়ালের কোণ পর্য্যন্ত অনেক রকম তুর্লভ স্বদেশী আর্টের সৃষ্টি করতে লাগলো। এমন কি তাঁর শ্রী-অঙ্গের হাইক্লাস ইয়োলো কাফ লেদারের মত রংটুকু ভুষো-পড়া লণ্ঠনের মত মলিন হয়ে গেল। আমরা সবাই ভাবিত হয়ে উঠলুম। পণ্ডিতজীর পরমভক্ত ভোজপুরী দরোয়ান রামশরণ সিং তো একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে একেবারে ঘেঁউ ঘেউ করে

কেঁদে ফেললে। বেচারীর ভয় হলো পাছে বাবাঠাকুর এইবার দেহ রক্ষা করে দেন।

হলধর খুড়ো তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, রামশরণ, তুই ভাবিস নে। আমি পণ্ডিতজীর ঠিকুজী দেখেছি, তাঁর পরমায়ু ১০৮ বচ্ছর। ঐ যে ওঁর ভুঁড়িটি দেখছিস ওটি একটি Famine Insurance Fund। উনি যদি বছর কতক অনাহারে যোগনিদ্রায় পড়ে থাকেন তবু ওঁর প্রাণবায়ু বা অপানবায়ু পথ হারিয়ে বেরিয়ে যাবে না। ওঁর অন্তরে অন্তরে জ্ঞান টনটন করচে। বিশ্বাস না হয়, বরং দু একটা রামচিমটি কেটে দেখতে পারিস।

রামচিমটির নাম শুনেই হোক, বা কোন সূক্ষ্ম অধ্যাত্মিক কারণেই হোক, পণ্ডিতজী চক্ষুরুন্মীলন করে উঠে বসলেন। আমাদের উড়ে ঠাকুর ঢোল-গোবিন্দকে ডাক দিয়ে বললেন—"আমার জন্যে এক ছটাক আতপ চাল, আধ পয়সার আসল গরুর ঘি, আর পোন্ পয়সার কাঁচকলা নিয়ে আয়। আজ আমি হবিষ্যি করবো।"

৮২৷৷৵০ ওজনের পাঁচপো চালের সোপকরণ অন্ন যে উদরে তলিয়ে যেত, সেখানে এক ছটাক হবিষ্যি কি রকম দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবে আমরা তাই ভেবে কাতর হয়ে পড়লুম। রামশরণ আবার ডুকরে কেঁদে উঠলো। পণ্ডিতজী তখন সস্নেহে বললেন—'কাঁদিসনে, রামশরণ কাঁদিসনে। তোদের জন্যেই আমার এ কর্ম্মভোগ। এতদিন যে তোদের আসল রামায়ণ মহাভারত পড়ালুম, সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়ে গেল। তোদের মন থেকে এখনো রাগ দ্বেষ গেল না। তোরা হুট করতেই লাঠি চালাস আর লোককে অগ্নিপক্ক করে তুলিস। এমন করলে দেশে স্বরাজই বা আসবে কি করে, আর সত্যযুগই আসবে কি করে?'

হলধর খুড়ো বললেন—"আমি সে দিন পাঁজিতে দেখলুম যে সত্যযুগ

আসতে আর মাত্র হাজার কয়েক বৎসর বাকি। এ কটা দিন যদি সবাই মিলে যোগনিদ্রা দিতে পারে তা হলে আর স্বরাজের জন্যে ভাবতে হয় না। ঘুম থেকে উঠলেই স্বরাজ পাকা খেজুরটির মত টুপ্ করে গোঁফের ডগায় এসে পড়বে।”

পণ্ডিতজী বল্লেন—“হ্যাঁ, তা হয় বটে; কিন্তু যোগনিদ্রা দেওয়া ত আর যার তার কাজ নয়। যাঁরা দেবার তাঁরা ত দিচ্ছেনই, এখন এই সব বাজে লোকগুলোকে নিয়ে করা যায় কি?”

খুড়োও তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করে বল্লেন—“তাই ত, করা যায় কি?’

পণ্ডিতজী বললেন—“বাংলাদেশের জন্যে বিশেষ কিছু ভাবতে হবে না। ম্যালেরিয়ার কল্যাণে বাংলা প্রায় সাত্ত্বিক হয়ে পড়েছে। বাঙ্গালীর মহাভারত পড়া সার্থক হয়েছে। দেখ, যুধিষ্ঠির যখন সশরীরে স্বর্গে গেলেন তখন ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব সবাই অর্দ্ধেক রাস্তায় কাৎ হয়ে পড়লেন। সঙ্গে গেলেন শুধু কুকুর-রূপী ধর্ম্ম। ধর্ম্ম যে কেন কুকুররূপী তার মর্ম্ম শুধু বাঙ্গালীই বুঝেছে।”

হলধর খুড়ো বল্লেন—“আজ্ঞে হাঁ; ওটা যা বলেছেন তা খুবই ঠিক। প্রভুর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে, পদলেহন করতে, উচ্ছিষ্ট খেতে, আর স্বজাতিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করতে আমাদের আর জুড়ি নেই। কুকুর-রূপী ধর্ম্ম এবার ষোল আনা আমাদেরই কাঁধে ভর করেছেন।”

পণ্ডিতজী বল্লেন—“সুতরাং বাঙ্গালীর জন্যে আমার ভাবনা নেই; তারা ত যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে স্বর্গে যাবেই। কিন্তু যাদের দেশে ম্যালেরিয়া নেই, ডিসপেপসিয়া নেই, যারা ঘরপোড়ান মহাবীরের পূজো করে, এ যুগে তাদের গতি কি হবে? তাদের কি করে সাত্ত্বিক করা যায়?”

হলধর খুড়ো বল্‌লেন—"আচ্ছা পণ্ডিতজী, ওদের দেশে হনুমানের পূজো উঠিয়ে দিয়ে যদি উড়িয়া জগন্নাথের পূজো প্রচলিত করা যায়, তা হলে শ্রীভগবানের ঠুঁটো রূপ দেখতে দেখতে ওদের লাঠি ধরা হাতগুলো ক্রমশঃ পঙ্গু হয়ে পড়তে পারে না ?"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"ঠিক বলেছ। যতক্ষণ ওদের হাত আছে ততক্ষণ ওদের সাত্ত্বিক হবার উপায় নেই। ওদের ঠুঁটো না করতে পারলে দেশে আধ্যাত্মিক স্বরাজ আসবে না। হাত দুখানি ওদের যদি জগন্নাথ-মার্কা হয়ে যায়, তা হলে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সের সময় আর শান্তি ভঙ্গের ভয় থাকবে না। এদেশে ত তা হলে স্বরাজ হবেই, তা ছাড়া দেশ বিদেশে তখন প্রেমের বন্যা ছুটে পড়বে। আমি বেশ দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি—ওদের সৎ দৃষ্টান্ত দেখে, ফিরিঙ্গিদের মাথা থেকে হ্যাট উড়ে গিয়ে একেবারে মান্দ্রাজী টিকি গজিয়ে উঠ্‌বে, মেম সাহেবদের মুখের পাউডার রসকলিতে পরিণত হবে। সব বিড়ালাক্ষী দাঁড়কাকক্ষী হয়ে যাবে। ট্রাউসারগুলি কৌপীন আর কোটগুলি আলখেল্লা হয়ে যাবে। হাই-লাণ্ডারেরা প্রেমের ভরে ধিন-তা-ধিনা করে নাচতে থাকবে, তাদের রাইফেলগুলি বাঁশের বাঁশরী হয়ে দাঁড়াবে, আর বিলেত একেবারে নবদ্বীপ হয়ে পড়বে। ঠিক বলেছ খুড়ো, তোমার মেধা-নাড়ী খুলে গেছে। এখন চল, ঠুঁটো জগন্নাথের মহিমা প্রচার করে বেড়ান যাক্।"

---

(৩৭)

আসল রামায়ণ

হলধর খুড়োকে একখানা পুঁথি বগলে করে ঘরে ঢুকতে দেখে গদাই আবদার ধরে বসলো—"খুড়ো আজ তোমার রামায়ণ শোনাতেই হবে

আমি দু'হপ্তা ধরে হাঁ করে বসে আছি, আর এ দিকে তোমার দেখা সাক্ষাৎ নেই!"

হলধর খুড়ো পাঁজিখানা টেবিলের উপর রেখে বিরক্তির সুরে বল্লেন—"আর দুঃখের কথা বলিস কেন গদাই! ঘোষেদের ছোটগিন্নির বুড়ো বয়সে ধর্ম্মেকর্ম্মে মতিগতি হয়েছে, তাই তাঁকে মানভঞ্জনের পালা শোনাতে গেছলাম। কথায় বলে, বৃদ্ধা—"

গদাই শেষ কথাগুলো চাপা দিয়ে বল্ল—"ছোটগিন্নির কথা ছেড়ে দাও খুড়ো। তাঁর লীলার আদিও নেই অন্ত নেই। তাঁর জন্যে ত আর রামায়ণ পাঠ বন্ধ থাকতে পারে না। তুমি আরম্ভ করে দাও।"

খুড়ো প্রসন্ন হয়ে চেয়ারের উপর বসে পুঁথিখানি খুলতে খুলতে বল্লেন—"এ খাঁটি রামায়ণের প্রায় ষোল আনাই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। বেল্লিক মুনির রামায়ণের সঙ্গে এর তফাৎ অনেকখানি। তবে এখানি যে রকম সাত্ত্বিক ছাঁচে ঢালা তাতে এইখানিই যে আদি ও অকৃত্রিম সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। রামচরিত্র পড়লেই মনে হয়—হাঁ, এ রাম আমাদেরই অবতার বটে! আমাদের ধাতের সঙ্গে একেবারে খাপে খাপে মিলে যায়। এ রামের প্রকৃতি যেমন মধুর, তেমনি মোলায়েম।"

গদাই ভাবে বিভোর হয়ে বলে উঠলো—"আহা যেমন রামরম্ভা!"

ভাবগ্রাহী শ্রোতা পেয়ে হলধর খুড়ো আরম্ভ করলেন—

"শ্রীরামচন্দ্র যখন অযোধ্যাপুরী আঁধার করে দণ্ডকারণ্যের মাঝখানে আশ্রম তৈরি করে বসলেন, তখন তাঁর দিন কাটতে লাগলো মন্দ নয়। ভাই লক্ষ্মণ তীর ধনুকগুলি ভেঙ্গে আশ্রমের চারিদিকে বেড়া দিলেন, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ না সেখানে ঢুকতে পায়। ভক্ত হনুমান কিষ্কিন্ধ্যা থেকে কলা, মুলা, বার্ত্তাকু সরবরাহ করতে লাগলেন। মা জানকী প্রভুর পদসেবা করেন আর মাঝে মাঝে চরকা কাটেন। স্বয়ং

প্রভুপাদ আহার করেন, নিদ্রা যান, আর মাঝে মাঝে আশ্রিত বানর-সঙ্ঘকে তত্ত্বোপদেশ দেন।

কিন্তু বিধাতার এমনি বিড়ম্বনা—কলা মূলা খেয়ে খেয়ে মা জানকীর অরুচি হয়ে গেল। তিনি লক্ষ্মণকে একদিন চুপি চুপি বললেন—'লক্ষ্মণ, তোমরা অযোধ্যার লোক, তোমাদের কাঁচামূলা আর একটু নুন হলেই চলে; কিন্তু মিথিলায় আমাদের একটু আমিষ না হলে কোন জিনিষ মুখে রোচে না। একদিন গোদাবরীতে ছিপ ফেলে দুটো মাছ ধরে আনতে পারো না?" লক্ষ্মণ আমিষের নাম শুনেই কাণে আঙ্গুল দিয়ে বললেন—'আর্য্যে! আমিষের দিকেই যদি মতিগতি থাকবে তো আমরা রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হবো কেন? যদি অনুমতি দেন, তো গোদাবরীর চড়া থেকে খুব সাত্ত্বিক পেঁয়াজ আপনাকে এনে দিতে পারি। কিন্তু আপনার জীব হিংসার প্রস্তাব যদি আর্য্য একবার শুনতে পান তো তিনি আমাদের ছেড়ে উদাসী হয়ে হিমালয়ে চলে যাবেন।'

তখন মা জানকী পা ছাড়িয়ে বসে কাঁদতে কাঁদতে শিরে কঙ্কণাঘাত করতে লাগলেন। শেষে কেঁদে কেঁদে যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন ঠিক করলেন যে আশ্রম ত্যাগ করে বাপের বাড়ী চলে যাবেন। মেয়ে মানুষের মন—অভিমান হলে ত আর রক্ষা নেই। লক্ষ্মণ যখন একটু সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করতে বেরিয়েছেন, আর রামচন্দ্র ধ্যানস্থ হয়ে তামাকু সেবন করচেন, তখন তিনি গয়নার পুঁটুলিটী বগলে করে আশ্রমের খিড়কী দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। একে জঙ্গল, তায় রাত, তার উপর স্ত্রীলোক। রাস্তা ভুলে তিনি উত্তর দিকে না গিয়ে একেবারে দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরে রাবণ রাজার মুল্লুকে গিয়ে হাজির হলেন। সঙ্গে পাসপোর্ট নেই। সুতরাং রাবণ রাজার প্রহরী তাঁকে গ্রেপ্তার করে একেবারে অশোক বনের অবলা-ধ্যারাকে নিয়ে গিয়ে হাজির।

এদিকে রামচন্দ্রের মনে একটু চা খাবার অভিলাষ উদয় হওয়ায় যখন তাঁর ধ্যানভঙ্গ হলো, তখন তিনি দেখলেন যে জানকীও আশ্রমে নেই, আর উনুনেও আগুন দেওয়া হয় নি। হাহাকার করে তিনি আর্যাসম্মত প্রথায় ভূমিতলে মূর্চ্ছা গেলেন। লক্ষ্মণ ফিরে এসে যখন মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে রামের মূর্চ্ছাভঙ্গ করলেন তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"ভাই লক্ষ্মণ রে, সীতা বিহনে এই বয়সে বুঝি বা আমার বল্কল পরতে হয়! হয় তুই সীতাকে খুঁজে এনে দে, নয় ত আমার আর একটা বিয়ের জোগাড় কর।' লক্ষ্মণ আর্য্যপুত্রকে এই রকম বিহ্বল দেখে হনুমানকে স্মরণ করলেন। হনুমান এসে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বল্লেন—'কুছ পরোয়া নেই। আমি এখনি এর ব্যবস্থা করছি।'

হনুমানের যে কথা, সেই কাজ। তিনি তড়াক্ করে গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপর চড়ে দূরবীণ দিয়ে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলেন যে রাবণ রাজার অবলা-ব্যারাকে চেড়ী পরিবৃতা হয়ে মা জানকী 'হা আর্য্যপুত্র, হা নাথ' বলে বুক চাপড়াচ্চেন আর বলছেন—'আর আমি বাপের বাড়ী যাব না, আর মাছ খেতে চাইব না।'

মা জানকীর এই অবস্থা দেখে ক্রোধে হনুমানের লাঙ্গুল দশ যোজন বিস্তৃত হয়ে পড়লো। তিনি গন্ধমাদন থেকে নেমে পড়ে রামচন্দ্রের কাছে হাতজোড় করে বল্লেন—'প্রভু, হুকুম দিন, এখনি আমি রাবণের দশটা মাথা ছিঁড়ে নিয়ে আসি।' রামচন্দ্র যুদ্ধ সম্ভাবনা দেখে ঈষৎ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মুখে বললেন—'হনুমান, তোমার ভক্তি দেখে আমি বিশেষ তুষ্ট হয়েছি, কিন্তু তোমার মন থেকে যতক্ষণ হিংসা প্রবৃত্তি না যাচ্চে ততক্ষণ তুমি যুদ্ধ করতে যেয়ো না। সাত্ত্বিক ভাবে যুদ্ধ যে করবে তার

অঙ্গ হিম হয়ে যাওয়া চাই, তার রক্ত জল হয়ে যাওয়া চাই। অতএব তুমি প্রথমে তিন দিন উপবাস করো।'

হনুমান জোড়হস্তে বল্‌লেন—'প্রভুপাদ, ঐ কার্য্যটি এ অধমের দ্বারা হবে না। আমাদের বানরগীতায় লেখা আছে—'আহারে নিধনং শ্রেয়ঃ অনাহারো ভয়াবহঃ।' খেতে খেতে যদি পেট ফেটেও যায়, তবু আহার ত্যাগ আমি করতে পারি নে, যেহেতু শাস্ত্রেই লেখা আছে—

'ভোজনে চাধিকস্তরস্তে মা হজমে কদাচন'

রামচন্দ্র তখন বল্‌লেন—'তাই ত, হনুমান, তুমি যে বিপদে ফেল্‌লে! তুমি রাবণের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ কর, লাঙ্গুল আস্ফালন কর, তাতে ত আমার আপত্তি নেই; কিন্তু তুমি যে অসাত্ত্বিক ভাবে রাবণের মাথা ছিঁড়ে ফেলবে, এতে ত আমি অনুমতি দিতে পাচ্চি নে। আচ্ছা, আমি স্বয়ং কি ভাবে সীতা উদ্ধার করি তা তোমরা একবার দেখো।'

এই কথা বলে শ্রীরামচন্দ্র গোদাবরীতে স্নান করে একখানি বিশুদ্ধ খদ্দর পরিধান করলেন। তারপর দক্ষিণাস্য হয়ে বসে রাবণকে কুকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত করবার সংকল্প করে 'হ্রীং কট কট্যায়ৈ স্বাহা' মন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

চব্বিশ ঘণ্টা এই রকমে কেটে গেল। রামের নড়নও নেই, চড়নও নেই। মুখও শুকিয়ে এসেছে। হনুমান লক্ষ্মণকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্‌লেন—'ছোট প্রভু, রাবণ রাজা ভারি জবরদস্ত। তাকে অনুতপ্ত করার চেয়ে তপ্ত করে তোলা ঢের সোজা। আপনি যদি আমার লেজে এক আঁটি খড় বেঁধে একটা দেশালাই জ্বেলে দেন, তা হলে খুব সহজে রাবণকে এক সঙ্গে তপ্ত ও অনুতপ্ত করে তুলতে পারি। কিন্তু দোহাই, দাদা, বড় প্রভুর কাছে গিয়ে যেন চুকলি করো না।'

লক্ষ্মণ তাতেই সম্মত হয়ে হনুমানের লেজে খড় বেঁধে দেশলাই জ্বেলে দিলেন। হনুমান ঝপাং করে অশোক বনে লাফিয়ে পড়ে উল্লম্ফন, বিলম্ফন, প্রলম্ফন করতে লাগলেন। চেড়ীরা ভয়ে যে যেখানে পারলে পালালো, আর হনুমান গয়ণার পুঁটুলি সমেত সীতা ঠাকরুণকে বগলে পুরে জয়রাম বলে লাফ দিলে গোদাবরী তীরে এসে হাজির হলেন।

মা জানকী ফিরে এসেই তাড়াতাড়ি একটু মিছরির সরবৎ তৈরি করে রামচন্দ্রের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লেন—'নাথ, আমি এসেছি।' রামচন্দ্র তখন পদ্মপলাশলোচন উন্মীলন করে হনুমানের দিকে চেয়ে ঈষৎ হাস্য করে বল্লেন—'দেখলে হনুমান, soul forceএর কি তেজ!'

হনুমান জোড়হস্ত হয়ে বল্লেন—"আজ্ঞে হাঁ, প্রভু, অধম বানর আমি, আপনার মহিমা কি বুঝবো? লেজের জ্বালা আমার যতদিন থাকবে ততদিন এ তত্ত্ব আমি ভুলবো না।"

হনুমান আবার এক লম্ফে কিষ্কিন্ধ্যায় চলে গেলেন। যাবার সময় লক্ষ্মণকে বলে গেলেন—"দেখো ছোট প্রভু; তোমরা দেবতা বলে তোমাদের একটু ভয় হয়। দেখো যেন বেইমানী করে বসো না। আর্য্য যদি টের পান যে তাঁর soul forceএর সঙ্গে খাদ মিশে গেছে, তা হলে হয় তো বলে বসবেন 'এ সীতা উদ্ধার শাস্ত্র সম্মত হয় নি। সীতাকে আবার অশোক বনে রেখে এসো।' তা হলে কিন্তু তোমাতে আমাতে একচোট বোঝা পড়া হয়ে যাবে।"

লক্ষ্মণ জিভ কেটে বল্লেন—'স্মারে রামচন্দ্র! তাও কি আমি পারি?'

হনুমান অন্তরীক্ষে উঠতে উঠতে বলে গেলেন—'কিছু বলা যায় না; তোমরা দেবতা, সব পার।'

হলধর খুড়ো রামায়ণ পাঠ শেষ করে পুঁথি খানি বন্ধ করলেন।

গদাই হাঁ করে শুনছিল। এইবার জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা খুড়ো, বড় অবতার কে?—রাম না হনুমান?

---

(৩৮)

নবীন ভারতী

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বেশ একটু ফুরফুরে হাওয়া বইছে দেখে মনে হলো—যাই একবার পণ্ডিতজীকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি। এই বুড়ো হাড়ে একটু মলয় পবন লাগালে পরে কোন না দু দশ বছর পরমায়ু বেড়ে যাবে? আস্তে আস্তে চাদরখানা কাঁধে ফেলে লাঠিগাছটা বগলে করে পণ্ডিতজীর ঘরের কাছে উঁকি মারতে গিয়ে দেখি, দুটী ছেলে তক্তপোষের একধারে বসে হাত পা ছুঁড়ে তুমুল বক্তৃতা সুরু করে দিয়েছে, আর পণ্ডিতজী এক টিপ নস্য নিয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হাঁচবার উদ্যোগ করেছেন। আমাকে দেখেই পণ্ডিতজীর হাঁচিটা কাশিতে পরিণত হয়ে গেল। দম্ আটকান থেকে একটু সামলে উঠে পণ্ডিতজী বললেন—"আরে বসো, দাদা, ছেলেদের বক্তৃতা শুনে কিঞ্চিৎ জ্ঞান-সঞ্চয় করে নাও।"

বুড়ো হাড়ে মলয় পবন লাগান আর হলো না। বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"ব্যাপারখানা কি?"

পণ্ডিতজী বললেন—"কি জানি, দাদা, তাই ত বোঝবার চেষ্টা করছি। পাঁচ সাত জন বড় বড় স্বদেশী পণ্ডিত মিলে না কি আবিষ্কার করেছেন যে, বাঙ্গালীর ছেলেদের পেটে জাতীয়তা ঢোকাতে গেলে আগে

তাদের শেখাতে হবে হিন্দুস্থানী। বাংলা বরং না শিখলেও চলতে পারে, কিন্তু হিন্দুস্থানী শেখা চাইই চাই।"

পাশ থেকে একটী ছেলে ফোঁস করে উঠল। বললে—"দেখুন, ঐ narrowness টা আমাদের ছাড়তে হবে। আমি বাঙ্গালী, কি পাঞ্জাবী, কি মারাঠি—সে কথা এখন ভুলে গিয়ে একটা All-India Consciousness গড়তে হবে। আমরা এক না হলে যে কিছুই হবে না। এ সোজা কথাটা আপনারা যে কেন ধরতে পারেন না, তা ত বুঝিনে!"

পণ্ডিতজী বক্তৃতার অবসরে আর এক টিপ নস্য নিয়ে বলনেল—"কি করবো, বাবা, আর দিন কত আগে বললেও বা হতো। এখন এই পঞ্চাশ বছর ভাত খেয়ে খেয়ে বুদ্ধিটা এমনি ভেতো মেরে গেছে যে, তার মধ্যে ছাতু প্রবেশ করান মুস্কিল! ভাল কথা—ঐ All-India Consciousness, ওটার বাংলা মানে কি হে?"

ছেলেটী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা চুলকুতে চুলকুতে বললে—"ওটার মানে কি জানেন—ওটা হচ্ছে কিনা—All-India Consciousness অর্থাৎ—"

পণ্ডিতজী ছেলেটীর মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—"অর্থাৎ?" ছেলেটী একটু বিরক্ত হয়ে বললে, "অর্থাৎ আমরা বাংলারও নই, পাঞ্জাবেরও নই; মহারাষ্ট্রেরও নই,—আমরা সারা ভারতের।"

পণ্ডিতজী চক্ষু ছাড়িয়ে রসগোল্লার মত করে বললেন, "ও! এই কথা! আমরা গোলাপও নই; টগোরও নই, জুঁইও নয়, এমন কি ঘেঁটুও নই আমরা শুধু ফুল। একেবারে আকাশ-কুসুম! তা, তোমরা ফুলই বটে, শুধু বাংলায় নয় ইংরেজীতেও বটে! কিন্তু আমি—আমি বাঙ্গালী, আমার চৌদ্দপুরুষ বাঙ্গালী। আমার রক্ত, মাংস, হাড় বাংলার মাটী থেকে গড়া, বাঙ্গালীর ভাবনা চিন্তা, সুখ দুঃখ হাসি কান্না, আশা

আকাঙ্ক্ষা আমার মনের পর্দ্দায় পর্দ্দায় জড়ানো। আমি তোমাদের সখের এক তার খাতিরে ত নিজেকে তুলো-ধোনা করে উড়িয়ে দিতে পারিনে। তোমরা যাকে একতা বলচ, সেটা এক হয়ে বেঁচে থাকা নয়, সেটা হচ্চে এক শ্মশানে গিয়ে মরা। সেটা মুক্তি নয়, লয়।"

পণ্ডিতজীর কথায় ছেলেটী যেন একটু হাঁপিয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে "আপনি কি বলতে চান যে, আমরা বাঙ্গালী—এই সঙ্কীর্ণ ভাবটা গিয়ে যদি "আমরা ভারতীয়" এই বড় ভাবটা আমাদের আসে, তা হলে আমাদের মঙ্গল হবে না?"

পণ্ডিতজী একটু হেসে বল্লেন—"বাংলা বড় কি ভারত বড়, এ কথার উত্তর গজকাটী দিয়ে মেপে বলে দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু বাঙ্গালীত্ব বড় কি ভারতীয়ত্ব বড়, এ কথার উত্তর ও রকম মেপে জুপে বলা চলে না। দুধ থেকে দই, ক্ষীর, ছানা, সর, মাখন হয়েছে বলে, এ কথা বলা চলে না যে এগুলো সব দুধের চেয়ে ছোট বা সঙ্কীর্ণ। বাংলা, পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান মহারাষ্ট্র, ইত্যাদি সব দেশগুলোকে বাদ দিলে যেমন ভারতবর্ষ বলে কিছু আর বাকি থাকে না তেমনি বাঙ্গালীত্ব, হিন্দুস্থানীত্ব, পাঞ্জাবীত্ব···এ সমস্তগুলো বাদ দিলে তোমার All-India consciousnessটা অশ্বডিম্ব হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের যা নিয়ে ভারতীয়ত্ব, সেই জিনিষটাই বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গালীত্ব, হিন্দুস্থানীর মধ্যে হিন্দুস্থানীত্ব, মারাঠীর মধ্যে মারাঠীত্ব হয়ে ফুটে উঠেছে। বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ভারতীয়ত্বও মারা যাবে। ভারতবর্ষের যেটা মানসরূপ, বাংলায় সেইটাই বাঙ্গালীত্ব হয়ে ফুটেছে। এটা ভৌগোলিক ব্যাপার নয় যে, ফুট ইঞ্চি দিয়ে মেপে এর মধ্যে ছোট বড় ঠিক করবে।"

ছেলেটী একটু গুঁই গাঁই করতে করতে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা, তাও যদি হয় ত ভাষার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কি?"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—আমরা যদি ছেলে বেলা থেকে গাধার দুধ খেয়ে মানুষ (?) না হতুম, তা হলে আজ আর এ কথাটা আমাদের বোঝাবার দরকার হতো না। যে সব জাত বেঁচে আছে, তারা সবাই জানে—তাদের প্রাণ কোথায়, আর ভাষার সঙ্গে সেই প্রাণটার সম্বন্ধ বা কি? গলা টিপে ধরলে যেমন দম্ আট্‌কে মানুষের প্রাণটা বেরিয়ে যায়, ভাষাটাকে মেরে দিলেও তেমনি জাতটার প্রাণও বেরিয়ে যায়। পরাধীন জাতের যতক্ষণ নিজের ভাষা থাকে ততক্ষণ বেঁচে ওঠবার আশাও থাকে। দেখনি সেইজন্য জর্ম্মানি পোলাণ্ডের ভাষা মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, ইংলণ্ড আইরিষ ভাষা মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল? আর আজ যদি তোমরা ভারত-জোড়া এক ভাষা করবার খাতিরে বাংলা ভুলতে আরম্ভ কর, তা হ'লে তোমাদের দুর্দ্দশা দেখে শেয়াল কুকুর কেঁদে যাবে।"

ছেলেটীও দেখলুম ছাড়বার পাত্র নয়। ভাষাতত্ব ছেড়ে দিয়ে সে রাজনীতির ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো। জিজ্ঞাসা করলে—"এক ভাষা না হলে আমরা মিল্‌ব কি করে? আর না মিললে এ দেশের দুর্দ্দশা ঘুচবে কোথা থেকে?"

পণ্ডিতজী হেসে উঠে বল্‌লেন—"না বাবা, তোমাদের এঁটে ওঠা দায়! বিশ্ব-বিদ্যার নাম করে যে তোমরা এত অবিদ্যা পেটে পুরে বসে আছ, এ আমার জানা ছিল না। এই ত চোখের সামনে দেখলে এত বড় একটা লড়াই হয়ে গেল। ইংরেজ, ফরাসী, রুস, জাপান, ইতালী, গ্রীস সবাই মিলে জার্ম্মানির সঙ্গে যুদ্ধ করলে; কৈ এক ভাষা নয় বলে ওদের একতার ত বাধা হয় নি। সব সৈন্যদের যদি একটা ভাষা শিখিয়ে তারপর যুদ্ধে পাঠান হতো, তা হলেই কেল্লা ফতে হয়েছিল আর কি! আর একটা কথা মনে রেখো যে সংখ্যায় বেশী হলেই শক্তি সব সময় বাড়ে না। এ জগতে বাঙ্গালীর চেয়ে ইংরেজের সংখ্যা বেশী নয়। ইংরেজ যে আধা

দুনিয়ার ঘাড়ে চড়ে বসে আছে, আর আমরা যে তার বুটের তলায় পড়ে আছি—এর সঙ্গে সংখ্যাধিক্যের বড় একটা সম্বন্ধ নেই।”

আমি দেখলুম যে কথা বাড়তে বাড়তে বেড়েই চলেছে। শেষে কি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বা'র হয়ে পড়বে? তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লুম—“থাক, দাদা, আজ এই পর্যান্ত। রাজনীতির চর্চ্চা কাল হলেও চল্‌বে; কিন্তু এই ফুরফুরে মলয় পবন কাল নাও বইতে পারে।”

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অন্যান্য পুস্তক।

১।	নির্ব্বাসিতের আত্মকথা	১৲
২।	বর্ত্তমান সমস্যা	৶০
৩।	সিনফিন্	।৵০
৪।	জাতের বিড়ম্বনা	৶০
৫।	অনন্তানন্দের পত্র	৶০
৬।	ধর্ম্ম ও কর্ম্ম	৶০

১২নং রামরতন বোসের লেনে প্রকাশকের নিকট ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

প্রিণ্টার—শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বসু।
কোহিনুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১১১।৪ এ, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।